কল্লান্ত

প্রবোধকুমার সান্যাল

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমান স্মমথনাথ ঘোষ

প্রীতিভাজনেষু

মুখবন্ধ

কল্লান্ত

প্রারম্ভ

ঠিক তা নয়

ইদানীং

মুখবন্ধ

শিবু হঠাৎ এলো গ্রামে। কামারের হাতুড়ির ঘায়ে আগুনের ফুল্‌কি যেমন ছিট্‌কে আসে, তেমনি সহর থেকে শিবু ছিট্‌কে গ্রামে এসে দাঁড়ালো। বছর তিনেক আগে কবে যেন সে গ্রাম থেকে চ'লে যায় এবং সে এতই নগণ্য সাধারণ যে, চ'লে যাবার পর কেউ তার খোঁজখবরও করেনি। কোনো প্রয়োজনও ছিল না।

শিবুর সঙ্গে এলো জনচারেক সহকর্মী,—তাদের হাঁক-ডাকে গ্রামের রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে মুখর। শিবুর পৈতৃক ভিটে ছিল শ্যাওড়া-জঙ্গলে ভরা, রাতারাতি সেটার সংস্কার আরম্ভ হয়ে গেল। সবাই একেবারে অবাক। এ যুদ্ধে লোকের অন্ন বস্ত্র জুটছে না, মহামারী রোগে চারদিক শ্মশান হয়ে চলেছে—আর তার মাঝখানে এসে সেই সেনগুপ্তদের শিবু কিনা বাড়ীঘর তুলছে? তার নামে জিনিষপত্র, মালমসলা আর লোকজন আসে কিনা নৌকাযোগে? গ্রামের লোকেরা অবাক হয়ে শিবুর দিকে চেয়ে থাকে। এ যুদ্ধে সবই সম্ভব।

ছেলেরা একদিন শিবুর কাছ থেকে একশো টাকা চাঁদা চেয়ে নিয়ে এলো তাদের ক্লাবের জন্য। সেই শিবু—যার ভাত জুটতো না তিন বছর আগে, যার লেখাপড়া হোলো না এম. ই. স্কুলে মাসিক আড়াই টাকা মাইনের অভাবে। পরের বাড়ী গতর খাটিয়ে যার বিধবা মা ম'রে গেল এই মাত্র পাঁচ বছর আগে—সেই শিবু! সমগ্র গ্রামে একটা চাপা আলোচনার ঢেউ উঠলো তাকে কেন্দ্র ক'রে।

গতকাল অপরাহ্ণে গ্রামের প্রান্তে ওই সুপারীগাছ ঘেরা দীঘির ধারে এক কাণ্ড ঘটে গেল। শিবুর লোকেরা ঘুঘুপাখী শিকার করতে গিয়ে তাদের একজনের বন্দুকের ছররাগুলি গিয়ে লাগে একটি মোরগের গায়ে। মোরগটি মারা যায়। কদু মিঞা এসে তাদের কাছে অনুযোগ জানাতেই শিবু তৎক্ষণাৎ একখানা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিল। কদু মিঞা হাঁ ক'রে রইলো।

বিস্ময়ের কথা, শিবু ধুতি পরে না; মূল্যবান প্যাণ্টের সঙ্গে পরে সিল্কের শার্ট; এবং তার পায়ে আজকালকার ওই কাবুলী ঘুন্টি-জুতো। সিগারেটের টিন তার হাতে হাতে ফেরে। একটি সিগারেটের প্রায় আধখানা সে খায়, বাকিটা পথের পাশে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে,—ঠিক যেন কাউকে ঢিল ছুঁড়ে মারলো। শিবুর মুখ সর্বদাই হাসি-হাসি।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এই গ্রামেই থাকেন। তাঁর নাম সাদাৎ আলী চৌধুরী। ইতিমধ্যেই শিবুর সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গেছে যে, এ-দৃশ্যটি বাস্তবিকই অনেকের পক্ষে ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে। শিবুর বাবা ওই সাদাৎ আলীর জন্যই একদিন মামলায় হেরে গিয়ে ফতুর হয়। ভদ্রলোক মারাই গেল বছর খানেকের মধ্যে,—এ গ্রামে বলতে গেলে শিবুদের আর কিছুই রইলো না তখন থেকে। লেখাপড়া দূরের কথা,—শিবুদের অন্ন জোটেনি কতদিন! ঠিক সেই সময়টায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

সাদাৎ আলী চৌধুরীর অধ্যবসায়ে হঠাৎ দেখতে দেখতে ইউনিয়ন বোর্ডের জায়গা-জমির ওপর কয়েকখানা পাকা করোগেটের ঘর উঠে দাঁড়ালো; কেবল তাই নয়, চাল ডাল আর কিছু নগদ টাকার জন্য উজনির ইস্কুল-ঘরটা এতদিন বন্ধ ছিল,—সেখানে গ্রামের প্রাইমারী শিক্ষকরা কয়েকজন ছেলেমেয়ে ডেকে ক্লাস বসালো। জানা গেল,

ছাত্রছাত্রীরা বই স্লেট আর জামা কাপড় পাবে। তারপর,—অবাক কাণ্ড! একই গ্রামে পাঁচটা টিউবওয়েল ব'সে গেল রাতারাতি; নতুন চালাঘরে নরহরি ডাক্তার গুছিয়ে বসলো,—এবং ছয়টা কেরোসিন কাঠের বাক্স বোঝাই ঔষধপত্র একদিন নরহরি ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে এসে পৌছল।

কেউ বললে, নদীর ঘাট থেকে আজুরির হাট পর্যন্ত পাকা রাস্তা হবে, বর্ষায় আর কাদা মাখামাখি করতে হবে না—

কেউ বা বললে, আরে রাখ তোর সাদাৎ আলী···এই যা কিছু সবই শিবুর পয়সা!

একথা সকলেই বিশ্বাস করে। এ যুদ্ধে সবই সম্ভব।

শিবু তার লোকজন নিয়ে একদিন হাটতলাটা ঘুরে গেল। তাকে দেখে সবাই আড়ষ্ট। তার দামী প্যান্টে কাদার ছিটে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই। শার্টের ঘরায় মুক্তোবসানো সোনার বোতাম; হাতে চারটে বিচিত্র আংটি; সুগন্ধ সিগারেটে তার বাতাসটি মিষ্ট-মধুর।

কিন্তু বিনয়ের ভারে অবনত তার মুখ। কোথাও তার আত্মাভিমান নেই, আত্মপ্রচার নেই,—সদাহাস্যে সে-মুখ বন্ধুবৎসল। সর্বদাই সেই ভঙ্গীটি যেন প্রকাশ করছে, আমি তোমাদের সেবক, অতি নগণ্য আমি!

তার পরদিন থেকে হাটতলায় লোক লাগলো। পাকা শানপালিশ ফড়েদের বসবার জায়গা; আলাদা আলাদা ছোট বড় ফোকর, জেলেদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত; মেয়েদের জন্য আব্রু। দেখতে দেখতে গ্রামের এদিক থেকে ওদিকে কী জনরব। আগামী সপ্তাহ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ, দুধ, কন্ট্রোলের দামে চাল ডাল আর কাপড়! শিবু যেন গ্রামে হঠাৎ সম্রাট হয়ে বসলো; এবং সাদাৎ আলী তার

প্রধান মন্ত্রী ! এটা হবারই কথা, কেননা এটা শিবুর পৈতৃকভূমি, এখানে সে মানুষ,—এখানকার পথে পথে এই সেদিনও সে না খেয়ে ট্যানা প'রে ঘুরেছে। আজ সেই শিবুর আবির্ভাবে সোনাডাঙ্গা যেন বেঁচে উঠলো। শিবু কেবল যে এ গ্রামে ঐশ্বর্যই আনলো. তাই নয়, সে যেন একটি মিলনের সংবাদও আনলো। এ গ্রামের সেই নগণ্য শিবু।

সেদিন কালীবাড়ীতে ছেলেরা শিবুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনলো। শিবুর সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করার জন্য গ্রামের সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। কিন্তু শিবু একা এলো না, সঙ্গে এলো তার দু'জন দেহরক্ষী; তারা খাকি রংয়ের জামাকাপড়-পরা। শিবুর পরণে অতি পরিচ্ছন্ন ধোয়া তাঁতের ধুতি; গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে হীরের আংটি; শিবুর চোখ দুটি সস্নেহ মাদকতায় জড়ানো। তাকে নিরীক্ষণ ক'রে সকলেই স্তব্ধ। সাদাৎ আলী গ্রামের পক্ষ থেকে শিবুকে সাদর-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আমাদের শিবেন্দ্র, গ্রামের উজ্জল রত্ন···তাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করার ভাষা আমার নেই।

শিবু তার ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের টিন থেকে সিগারেট বা'র ক'রে সবিনয়ে ধরালো। কেবল মিষ্ট কণ্ঠে বললে, আমি সামান্য, তবে আপনাদের স্নেহেই আমি বড় হ'তে পারি।

তার সিগারেট ধরানো দেখে গ্রামের বৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় হরেন রায় মশায় নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শিবুর বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়,—কিন্তু তার মাথা এত উঁচুতে উঠলো কেমন ক'রে, এ সংবাদ কারো জানা নেই। মোট কথা, এ যুদ্ধে সবই সম্ভব।

সেই সভাতেই সাদাৎ আলী প্রকাশ করলেন, শিবেন্দ্র শীঘ্রই কলকাতায় ফিরবেন, তবে এই কালীবাড়ীকে নতুনভাবে তৈরী করার

জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবেন। তাঁর খরচেই দাতব্য চিকিৎসালয়, ইস্কুল, অন্নসত্র ইত্যাদি চলবে। তা ছাড়া এ গ্রাম থেকে মহামারী, দারিদ্র্য ও অন্নবস্ত্রের অভাব ঘোচাবার জন্য তিনি নাকি বদ্ধপরিকর। কলকাতায় চ'লে গেলেও বছরে তিনি একবার অবশ্যই আসবেন। আমাদের মস্ত সৌভাগ্য যে, তিনি এত কষ্ট ক'রে—ইত্যাদি। শিবু সকলের প্রতি আনত হয়ে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালো। সভায় সকলের মুখেই সাধুবাদ, ছেলেদের মুখে ধন্য ধন্য। সেই শিবু!

শিবুর জন্য গ্রামের সীমানায় একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। সেটি অস্থায়ী, কারণ শিবুকে শীঘ্রই চ'লে যেতে হবে,—তবু সেই তাঁবুর মধ্যে সাজসরঞ্জামের কোনো ত্রুটি ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা বেশী-দিন সে এখানে আছে,—এজন্য কলকাতা থেকে আরো কয়েকজন লোকজন এসে পৌঁছেচে। শিবুর ক্যাম্পের বাইরে আছে ইলেকট্রিক ডায়নামো,—সুতরাং দিনে পাখা ঘোরে, রাত্রে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। আকাশ ভালো থাকলে রান্না-বান্না বাইরেই হয়। মাছ ধ'রে এনে খাকি পোষাকপরা চাকর-বাকররা মাছ কুটতে বসে, কিম্বা মাংস রাঁধে, কিংবা পোলাও বানায়। আর অদূরে আ'লের কাছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন ওই আ'লের ধারের রাস্তাটায় কানা-ফটিকের সঙ্গে শিবুর হঠাৎ দেখা। কানা-ফটিক ভুরু উঁচু ক'রে বললে, পেন্নাম হই, শিববাবু।

শিবু হাসিমুখে বললে, বাবু হলুম কবে থেকে, ফটিক?

কানা-ফটিক বললে, কলকাতার বড়লোক বাবু বৈ কি!

শিবু একটু আত্মীয়তা ক'রে বললে, কেমন আছ? কী কর আজকাল?

আমাদের আর থাকাথাকি। সেই ঘরামির কাজই করি। তবে কাজ কম···খড় নেই, দড়ি নেই···যুদ্ধে গেল সব। মনে পড়ে, তুমি আমার সঙ্গে কদ্দিন বেড়া বাঁধতে?

কানা-ফটিকের কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার তাপ লক্ষ্য ক'রে শিবু আর কথাটা বাড়াতে চাইলো না। কেবল বললে, মনে হচ্ছে অনেক কালের কথা,—যাকগে। ছোট লাহিড়ীদের খবর কি? জানো কিছু?

কানা-ফটিক বললে, ছোটবাবু মারা গেছেন।

মারা গেছেন? শিবু চমকে উঠলো।

হ্যাঁ, মারা গেছেন আজ বছর দেড়েক। হঠাৎ হেসে ফটিক বললে, বেশ মনে পড়ে, ছোটবাবু তোমাকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না।

শিবু চুপ করে রইলো কতক্ষণ। অবশ্য এ সব কথা কানে শোনা, এখন তার পক্ষে কিছু মর্যাদাহানিকর। কেবল এক সময় একটু নিশ্বাস ফেলে বললে, খুড়ি মা?

কানা-ফটিক বললে, তিনি আছেন, তবে খুবই কষ্ট। বলতে গেলে দিন চলে না। চোরাবাজারে চাল কেনা···কাপড় কেনা···কোত্থেকে পাবে বলো! বিধবা মানুষ! ছেলেটা নাবালক।

শিবু বললে, আচ্ছা, এসোগে তুমি—

কয়েক পা গিয়ে কানা-ফটিক একবার মুখ ফিরিয়ে শিবুর দিকে চেয়ে হাসলো। বললে, তুমি ওদের ভাত অনেক খেয়েছো শিববাবু—

শিবু কথা বললে না, ওকথাটা তার কানে না ঢোকাই ভালো।

তাঁবুতে ফিরে এসে কানা-ফটিকের কথাটা শিবুর দুই কানে খোঁচাতে লাগলো। ছোট-লাহিড়ী তাকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না, তবু শিবু গোপনে গিয়ে ওদের বাড়ীতে ভাত খেয়ে আসতো। ওখানে

সে উপকৃত, কৃতজ্ঞ এবং ঋণী—এতে ভুল নেই। কোথায় কোথায় তার ঋণ আর কৃতজ্ঞতা—সে সব জানে, তার স্মৃতিশক্তি জলজলে। ছোট-লাহিড়ী ম'রে গেল, শিবুর অবস্থার পরিবর্তন দেখে গেল না। বেঁচে থাকলে শিবু তাকে কিনে ফেলতে পারতো,—তার ঘর-খামার, আসবাব-সজ্জা সব সুদ্ধ। শিবু উপেক্ষিত অপমানিত ছিল চিরকাল,—এবার তার জাগ্রত পৌরুষ সবাইকে জয় ক'রে নেবার জন্য ঠিক যেন অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাতে চায়। সে তার দানের অজস্রতায় সকল উপেক্ষা আর অবহেলাকে জয় করবে।

পরদিন সকালে সে ছোট-লাহিড়ীদের উঠোনে এসে দাঁড়ালো। খুড়িমা ছিলেন পূজোর ঘরে, তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, ওমা, শিবু যে ?

শিবু তাঁর পায়ের ধূলো নিল। খুড়িমা বললেন, অনেকদিন এসেছিস শুনছি, এতদিনে বুঝি মনে পড়লো রে ?

শিবু হাসিমুখে বললে, নানা ঝঞ্ঝাটে কাটছে,—নিরিবিলি তোমার এখানে আসবো ভেবেছিলুম।

খুড়িমা বললেন, এখানে থাকবি নাকি ?

না খুড়িমা, দু' একদিনের মধ্যেই যেতে হবে—অনেক কাজ, তোমরা কেমন আছ ?

অমনি এক রকম, বাছা। দেখতেই পাচ্ছিস, দিনকাল বড় খারাপ। যুদ্ধ কবে থামবে বল্ ত' ?

শিবু হাসিমুখে বললে, যুদ্ধ এখন না থামাই ভালো, থামলেই আমাদের লোকসান।

বটে! খুড়িমা বললেন, তোরা না হয় ফেঁপে উঠলি,—আমরা যে তলিয়ে গেলুম রে! আর দিন চলে না।

এমন সময়ে ঘাট থেকে উঠে ভিজা কাপড়ে খুড়িমার মেয়ে লাবণ্য এসে দাঁড়ালো। শিবু মুখ ফিরিয়ে বললে, ভালো ত' লাবণ্য?

লাবণ্য ঘাড় নেড়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চ'লে গেল। শিবু বললে, আমি ভেবেছিলুম লাবণ্যর বিয়ে হয়ে গেছে।

খুড়িমা বললেন, তা আর হোলো কোথায় বাছা। বিয়ের সব ঠিকঠাক,—উনি মারা গেলেন। পাত্তর ভেগে গেল। তারপর এই যুদ্ধের হিড়িক,—জাপানীদের ভয়ে কে কোথায় পালাবে তার ঠিক নেই। জিনিষপত্তর পাওয়া যায় না, দেশে দুর্ভিক্ষ আর রোগ। বিয়ের টাকাকড়ি সব খরচ হয়ে গেল। লোকে খেয়েপ'রে বাঁচবে, না ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে বল্ দেখি?

শিবু বললে, এ তোমাদের অন্যায় খুড়িমা,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা উচিত। তোমরা কলকাতা গেলে না কেন? সবাই সেখানে যা হোক দু'পয়সা করছে, তোমরাই শুধু পিছিয়ে রইলে।

খুড়িমা বললেন, ওমা, তুই বলিস কিরে? জানা নেই, শোনা নেই, কলকাতায় গিয়ে দাঁড়াবো কোথায়?

শিবু বললে, বাঃ, আমি বুঝি নেই সেখানে? তোমার কাছে একটা খবর পেলে আমি অন্ততঃ চেষ্টাও করতে পারতুম।

খুড়িমা বললেন, তুই ত' সেই তিন বছর আগে গাঁ থেকে বেরিয়ে কাদের সঙ্গে গেলি কলকাতায়। কে যেন বললে, তুই নাকি আসামে; কেউ বললে চাটগাঁয়। তোর এত টাকা হোলো কোত্থেকে বল্ ত'?

শিবু নতমুখে বললে, কি যে বলেন খুড়িমা—কী আর সামান্য!

একে তুই সামান্য বলিস? গাঁয়ে এসে তুই নাকি এরই মধ্যে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছিস? এত পেলি কোথায়, শিবু?

শিবু বললে, তোমাদের জন্যে যদি কিছু না করতে পারি, তবে আমার টাকা-পয়সার কোনো দামই নেই, খুড়িমা!

এমন সময় হাসিমুখে লাবণ্য বেরিয়ে এলো। এত অভাব আর অনটনের মধ্যেও তার স্বাস্থ্যশ্রীর দিকে তাকিয়ে শিবু যেন পলকের জন্য একটু উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়লো। লাবণ্য বললে, অনেক টাকা নাকি তোমার শিবুদা···শুনতে পাচ্ছি। আজ বুঝি বাড়ী বয়ে কিছু দান করতে এলে?

শিবু বললে, এতখানি স্পর্ধা আমার নেই, লাবণ্য। এ-বাড়িতে ভাত খেয়ে আমি মানুষ···এখানে টাকার অহঙ্কার দেখাতে আসিনি। তোমরা ভুল বুঝো না।

খুড়িমা বললেন, তুই আমাদের জন্যে কী করতে চাস, বল্?

শিবু বললে, তোমরা আমার সঙ্গে চলো।

কোথায় রে?

কলকাতায়। বলু আর লাবণ্যকেও নিয়ে চলো।

কলকাতায় দাঁড়াবো কোথায়?

শিবু বললে, কেন, আমার কুঁড়েঘর কি নেই?

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, তুই বিয়ে করেছিস?

শিবু হেসে ফেললো। বললে, তোমরা বিয়ে ত' দাওনি?

লাবণ্য কটাক্ষ ক'রে বললে, লেখাপড়া ত' শেখোনি একটুও—এবার টাকার জোরে মেয়ে ঘরে আনো।

শিবুর আহত পৌরুষ পলকের জন্য জলে উঠলো, কিন্তু এ-বাড়ীর অন্নে সে মানুষ—কঠিন কঠিন কথা তার মুখে এলো না। কেবল লাবণ্যর দিকে একবার তাকিয়ে খুড়িমাকে বললে, যদি যেতে রাজি থাকো তাহ'লে আমি—

মাঝপথে তাকে থামিয়ে লাবণ্য বললে, দেনাশোধ করা চাই, কেমন শিবুদা? সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের ভাত-কাপড় দিয়ে পুষবে, এই ত?

খুড়িমা বললেন, তুই কি সেখানে একা থাকিস?

শিবু বললে, আর কে থাকবে বলো? কেবল কাজকর্ম থাকলে বাইরের লোক আসে-যায়।

লাবণ্য বললে, কিন্তু আমরা গিয়ে তোমার ঘাড়ে চাপতে যাবো কেন বলো ত? বেশ ত'—তুমি দয়ালু, এ আমরা জেনে রাখলুম।

শিবু বললে, তা নয়, আমি তামাসা করতে আসিনি লাবণ্য,—সেখানে গেলে তোমরা সকলেই কাজ পাবে, তাই বলছি।

খুড়িমা বললেন, আমরা কী কাজ করবো, শিবু?

শিবু বললে, আজকাল বাড়ীতে ব'সেও অনেক কাজ করা যায় খুড়িমা। এটা যে যুদ্ধের যুগ। তাছাড়া বলু যত ছেলেমানুষই হোক, ওর একটা কাজ ঠিকই জুটে যাবে, আমি ব'লে রাখছি।

লাবণ্য বক্রোক্তি ক'রে বললে, ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল, তাই তুমি মানুষ হ'লে শিবুদা!

শিবু বললে, তুমিও মানুষ হয়ে ওঠো, এই চাচ্ছি।

বাঁকা চোখে চেয়ে লাবণ্য বললে, তোমার আজকাল পয়সা হয়েছে, উপদেশ ছড়াবে বৈকি।—এই ব'লে সে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, তুই কবে চ'লে যাবি?

শিবু বললে, ভাবছি কালই যাবো।

কিয়ৎক্ষণ কী যেন চিন্তা ক'রে খুড়িমা বললেন, তুই এত ক'রে বলছিস,—না হয় মাসখানেকের জন্য কলকাতায় যেতে পারি। কিন্তু বাছা, আমাদের পুঁজি কিছু নেই। নৌকোভাড়া রেলভাড়া—এসব

ঘর ঠ্যাঙালেও বেরোবে না। ঘরে চাল নেই, নুন নেই, কাঠ নেই। ইস্কুলের মাইনের অভাবে বলুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। একখানা কাপড়ের জন্যে অত বড় মেয়ে বাইরে বেরোতে পারে না। তা সে যাই হোক, ওই এক মাস,—তারপরেই আমি বাছা ফিরে আসবো। কলকাতায় কত গোলমাল, সেখানে থাকতে আমার ভরসা হয় না, শিবু।

রান্নাঘর থেকে গলা বাড়িয়ে লাবণ্য বললে, শিবুদার বাহাদুরিটা দেখে আসতে তোমার এতই ইচ্ছে মা—

খুড়িমা এবার বললেন, তুই ভারি যা-তা বলিস, লাবণ্য!

লাবণ্য হেসে বললে, বড়মানুষিটা না দেখাতে পারলে বড়লোকরা আবার খুশী থাকে না। কি বলো, শিবুদা?

শিবু বললে, তোমাদের বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছি, যা খুশি তাই বলতে পারো!

লাবণ্য উঠে এলো। বললে, তোমার বাড়ীতে গেলে তুমিও বুঝি আমাদের যা খুশি তাই বলবে? রক্ষে করো, আমি যাবো না।

শিবুর মুখে খুব একটা কঠিন কথা এসেছিল, কিন্তু সে আপন জিহ্বাকে সংযত করতে গিয়ে হেসে ফেললো। বললে, যাঃ কী যে বলো তুমি!—তোমার মেয়ের এখনও জ্ঞান-বুদ্ধি হয়নি, খুড়িমা।

লাবণ্য অবাক হয়ে কিয়ৎক্ষণ শিবুর দিকে তাকালো। তারপর বললে, বাঃ—সেই শিবুদা! বাবা বেঁচে থাকলে ভালো হোতো। তা বেশ, তোমার ওখানে গেলে তুমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি একটু পাকিয়ে দিয়ো?

শিবু বললে, খুড়িমা, তবে ওই কথাই রইলো। দুপুরবেলা নৌকো ছাড়বো। আমি নিজে এসে তোমাদের নিয়ে যাবো।

খুড়িমা বললেন, আচ্ছা, আমরা তৈরি হয়ে থাকবো।

শিবু চ'লে গেল। কিন্তু বাইরে এসে সে অনুভব করলো, নিষ্ফল একটা ক্রূর আক্রোশে তা'র সর্বশরীর কাঁপছে। লাবণ্যর অহঙ্কার অসহ্য! দারিদ্র্য, হতমান, অনটন,—কিন্তু ছোটলাহিড়ীর সেই মেয়ের কী পর্বতপ্রমাণ আত্মাভিমান! সে যত বড় ধনীই হোক, ওরা তা'কে মানুষ ব'লে মনে করে না,—ওরা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ওরা বংশানুক্রমিক অভিজাত। আভিজাত্যের সেই নীলরক্তের গর্ব ওদের চোখে মুখে মেদমজ্জায়। ঘরে অন্ন নেই, পরণে লজ্জানিবারণের বস্ত্র নেই,—কিন্তু আত্মম্ভরিতায় মেয়েটা অন্ধ। ওর স্বাস্থ্যশ্রীটি পুরুষের পক্ষে লোভনীয়,—কিন্তু শিবু ত' কম নয়! শিবুও ত' এতদিন পরে পাত্র হিসাবে কন্যাজগতে লোভনীয় হয়ে উঠেছে!

শিবু তিন বা'র ক'রে সিগারেট ধরালো। পথ দিয়ে সে চলেছে, কত লোক চেয়ে রয়েছে তার দিকে। কিন্তু ওই ওরা শিবুর কাছে উপকার নিয়ে যেন শিবুকে কৃতার্থ করবে! পথের লোক তাকে মানে; ঘরের লোক তাকে মানে না। বহু জনসাধারণ তাকে মহিমার আসনে বসায়, কিন্তু বহুপরিচিতরা তাকে আমল দেয় না। আর ওই লাবণ্য! লাবণ্য তার ভ্রূভঙ্গিতে যেন শিবুকে জানিয়ে দিল, তুমি এ-বাড়ীর ভাত খেয়ে মানুষ, তুমি এই সেদিনও এ-বাড়ীর আনাচে-কানাচে বয়াটে ছেলের মতন ঘুরে বেড়াতে। টাকা তোমার এ যুদ্ধে যতই হোক, তোমার মর্যাদা কিছু নেই। তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হওনি, বিদ্যাবুদ্ধিতে মহৎ হওনি,—তুমি যুদ্ধের জুয়ায় কিছু পয়সাকড়ি করেছ, এইমাত্র। এর বেশী তুমি কিছু নও।

শিবু যেন কোথায় নিজেকে আহত অপমানিত ও ক্ষুদ্র মনে করতে লাগলো। তার চোখ দুটো যেন জ্বালা করে উঠছে কেমন এক-

প্রকার আত্মগ্লানিতে। সে যেন লাবণ্যদের ওখানে নিজের মস্ত কিছু একটা দেখাতে গিয়েছিল, কিন্তু লাবণ্য যেন তার কান ম'লে দিয়ে তাকে যথানির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল।

সমস্ত দিনটা শিবু অন্যমনস্ক হয়ে রইল। কত লোক এলো কত কাজে। কত লোকের কত আবেদন, কত কর্মপন্থার নির্দেশ। বারোয়ারিতলা, ক্লাব, ইস্কুল, কালীবাড়ী, হাটতলা, ইউনিয়ন বোর্ড,— কত বিষয়ের কত আলোচনা দীর্ঘরাত্রিব্যাপী চললো। কিন্তু সব কাজকর্ম ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে শিবু যেন নগণ্য ক্ষুদ্র ও হতমান হয়ে বিড়ম্বিতের মতো ব'সে রইলো।

*   *   *   *

সমস্ত পথটা লাবণ্য এবং তার মা অনেকটা যেন বিমূঢ়ের মতো বসে ছিল। ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় তাদের এই প্রথম, এবং এই যাত্রার আনুষঙ্গিক যা-কিছু থাকা দরকার, সমস্তই রাশি রাশি। সঙ্গে চাকরবাকর, তকমাপরা দারোয়ান, সহকর্মী জন তিনেক। শিবু যেন হঠাৎ ফেঁপে উঠেছে, উপচিয়ে পড়ছে তার টাকাপয়সা, কেবল খরচের উপলক্ষটা পাওয়া,—ব্যস, টাকাকড়ি জলস্রোতের মতন বেরিয়ে পড়ে। মা ও মেয়ে অভিভূত, হতচকিত।

গাড়ী কলকাতায় পৌছলে দেখা গেল, শিবুর জন্য সবাই রয়েছে অপেক্ষা ক'রে। দু'খানা চকচকে মস্ত মস্ত মোটর এসেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। শিবুর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ সেলাম জানালে সে সেলাম নেয় না, নমস্কার জানালে প্রত্যুত্তর নেই, আগ্রহ প্রকাশ করলে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। শিবু সবাইকে এড়িয়ে খুড়িমা ও লাবণ্যর সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

লেক্-রোডে এক প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা বাড়ীতে এসে তারা মোটর

থেকে নামলো। ফটকের একটি স্তম্ভে এক কাঁচের বাক্সের মধ্যে শিবুর নাম ইংরেজি সংক্ষিপ্ত হরপে লেখা,—এস. এন. সেনগুপ্ত। গাড়ী এসে থামতেই বুড়ি আয়া এসে দাঁড়ালো, তার সঙ্গে এলো ঘরকন্নার আলাদা ঝি-চাকর। বোঝা গেল, খুড়িমা ও লাবণ্যর আসার খবর আগেই এসে পৌঁছেচে। এতক্ষণে লাবণ্যর মুখখানা ক্লান্ত দেখা যায়। লাবণ্যর সমস্ত পরিহাসবুদ্ধি একেবারে অসাড় হয়ে গেছে।

নীচের সামনের অংশে মস্ত আপিস-ঘর। লাবণ্য প্রশ্ন করলো, এটা কিসের আপিস, শিবুদা?

ওটা হিসেবের দপ্তর, এসো তোমরা।—শিবু তাদের নিয়ে অগ্রসর হোলো।

মার্বেল-পাথরের দালান আর সিঁড়ি, অসংখ্য আয়না আর ছবি, অজস্র আসবাবপত্র, ঝাড়লণ্ঠন, কত রকমের টেবল্ ও কুশন্, কত বিচিত্র ঘড়ি ও তাদের টুংটাং আওয়াজ। একটি ঘরে ঢুকবার আগে খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, ঘরে ঢুকবো, ভিতরে কে যেন কথাবার্তা বলছে, শিবু?

শিবু বললে, কেউ নয় খুড়িমা, ওটা রেডিয়ো। এইটিই আপনাদের ঘর। এটায় শোওয়া চলতে পারে,—এরই মধ্যে স্নানের ঘর আছে। পাশে আপনাদের বসবার ঘর। আয় বলু, আমার সঙ্গে।

বছর তেরো বয়সের অর্বাচীন ছেলেটি [illegible] শিবুর সঙ্গে এগিয়ে গেল। কোথায় যেন তখন টেলিফোন বাজছে।

খুড়িমা চেয়ে থাকেন লাবণ্যর দিকে, লাবণ্য সলজ্জভাবে তাকায় মায়ের প্রতি। তাদের হাত-পা আসে না। কলকাতার শ্রেষ্ঠ অভিজাত-পল্লীতে এই প্রাসাদ হোলো শিবুর,—শিবু এই সম্পত্তির

মালিক। তিন বছর আগের সেই শিবু, যার একবেলা ভাত জুটতো না! মাত্র এই তিন বছর! এ যুদ্ধে কী না সম্ভব?

কিন্তু কিছু তলিয়ে দেখার মতো অবস্থা খুড়িমার ছিল না। তাঁরা বসবেন, কি দাঁড়াবেন, কিম্বা বাইরে আসবেন, অথবা স্নানের আয়োজন করবেন,—কিছুই বুঝতে না পেরে যখন অভিভূতের মতো আড়ষ্ট হয়ে রয়েছেন,—সেই সময় এ-বাড়ীর প্রধান পরিচারক এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একরাশি তসর ও রেসমের জামা-কাপড়। ব্রাহ্মণ পাচক তার পিছু পিছু এসে বললে, মা, আপনি ভাঁড়ার-ঘরে আসুন—এই নিন চাবির গোছা, বাবু পাঠালেন।

এমন সময় বলু এসে দাঁড়ালো যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাহেববাচ্চার মতো। ইতিমধ্যেই সে সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে দেখে এসেছে। তার দিকে তাকিয়ে লাবণ্য সহসা ঝড়ের মতন খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

বিকালের দিকে এক সময় খুড়িমা শিবুকে দেখতে পেয়ে বললেন, তোর এখানে তেমন হিঁন্দুয়ানী নেই বাছা!

শিবু হেসে বললে, তবেই হয়েছে, এটা যে কলকাতা খুড়িমা! ওসব এদিকে নেই!

ওমা, সে কি রে?

শিবু বললে, তোমরা সেকেলে লোক,—কত রকম কুসংস্কার তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকো, এ যুগে ওসব চলে না খুড়িমা—

বাইরে মোটরের হর্ন বাজলো। শিবু পুনরায় বললে, তোমাদের গাড়ী এসেছে। কই, লাবণ্য কোথায়?

খুড়িমা বললেন, গাড়ী! গাড়ী কেন রে?

বেড়াতে যাবে না তোমরা? একটু হাওয়া খেয়ে এসো মাঠের দিকে। ওতে মন ভালো হয়!

কার সঙ্গে যাবো বাছা?

শিবু হেসেই খুন। বললে, কোনো দরকার নেই, আমার সরকার আর দারোয়ান সঙ্গে থাকবে। সিনেমায় যাবে খুড়িমা?

না বাছা—

লাবণ্যকে নিয়ে খুড়িমা যখন শিবুর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসবেন, সেই সময় দু'জন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি ফটকে ঢুকছে। শিবুকে দেখে তারা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে কাছে এলো। লাবণ্য ও খুড়িমা আড়ষ্ট হয়ে কুঁকড়ে সরে যাবার চেষ্টা করতেই শিবু বললে, এই যে আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—

কি যেন একটা কাণ্ড ঘটে গেল এক মিনিটে। ভুল-ইংরাজি ভাষায় শিবু ঝর-ঝর করে কতকগুলো কথা বলে গেল,—লাবণ্য ও খুড়িমা গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। বলু গিয়ে আগেই গাড়ীতে বসলো।

গাড়ীর কাছে এসে শিবু বললে, সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হয়, এটা কলকাতা! আগেকার সেসব আব্রু আজকাল আর নেই।

লাবণ্য শিবুর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললে, লজ্জা-মান খোয়াতে আর কেউ লজ্জা পায় না, এই বলছ ত'?

মোটর ছেড়ে দিল। শিবু সেখানে দাঁড়িয়ে মোটরের দিকে তাকিয়ে রইল চুপ করে। লাহিড়ীরা যত বড় অভিজাত হোক, কোনোকালে মোটর কেনেনি, এটা শিবু জানে। এ বাড়িখানা তৈরী করতে যত টাকা লেগেছে, লাহিড়ীরা অত টাকার গল্পও শোনেনি কখনও। লাবণ্যর দম্ভ, লাবণ্যর তেজ। কিন্তু লাবণ্য জানে না, গোটাকয়েক টাকা ফেললে এই কলকাতা সহরের লাখ লাখ লাবণ্যর

যে-কোনো লাবণ্য আজই রাত্রে পায়ের তলায় এসে পড়ে। এই ত লাবণ্যর এত অহংকার,—কিন্তু রেশমী শাড়ী আর জামা হাত পেতে নেবার সময় তার আত্মসম্মানে একটু বাধেনি! কোথায় গেল লাহিড়ী-বংশের পর্বতপ্রমাণ গর্ব, কোথায় রইলো নিষ্ফল আভিজাত্যবোধ? একথা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, যারা যোগ্য—এ যুগে তারাই বাঁচবার অধিকার পায়; অযোগ্যের জায়গা কোথাও নেই!

সেদিন রাত্রে খুড়িমা শিবুকে ধরে বসলেন, তোর অবস্থা কেমন করে ফিরলো, এবার আমাকে বলতে হবে শিবু—

শিবু বললে, খুব সোজা! মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট জোগাড় করেছিলুম একটু কষ্ট করে। ঝুড়ি, ঝাঁটা, বুরুশ—এইসব চালান দিই। মুরগী আর পাঁঠা যোগাড় করি। এ ছাড়া কম্বল, চামড়া—এমন কি আলু-পটলও সাপ্লাই করেছি খুড়িমা?

খুড়িমা বললেন, তাইতে এত, শিবু?

না—শিবু বললে, আমি গিয়েছিলুম আসাম আর চাটগাঁয়ে। উড়ো-জাহাজ নামবার মাঠ তৈরী হবে—কুলীরা পালাচ্ছে জাপানী বোমার ভয়ে—আমি এদেশ-ওদেশ ঘুরে দু'হাজার কুলী জোগাড় করে এনে দিতুম। তাতে অনেক টাকা। এমন বহুবার জোগাড় করে দিয়েছি।

খুড়িমা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। শিবু বললে, পাহাড় আর জঙ্গল কেটে রাস্তা বানাতে গেলে লেখা-পড়ার খুব বেশী দরকার হয় না, খুড়িমা। আমি কাজ করতে জানতুম।

খুড়িমা কতক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে রইলেন। শিবু বলতে লাগলো, টাকা কেমন করে আসে জানতে পারিনে—কোথা থেকে কেমন করে আসে হঠাৎ হাজার হাজার টাকা! পরিশ্রমের টাকা নয় খুড়িমা,

সমস্তটাই যেন জুয়া, জুয়ার টাকা, এতবড় যুদ্ধটা একটা জুয়া ছাড়া আর কিছু নয়! যাদের টাকা নেই, তারা মনে করবে আজগুবি কথা বলছি, কিন্তু টাকা যাদের আছে তারা জানে টাকা আনা কত সহজ!

খুড়িমার মুখে আর একটিও কথা সরলো না। তিনি অলক্ষ্যে অভিনিবেশ সহকারে শিবুকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

চার পাঁচদিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর শিবু ভিতর মহলে এলো খুড়িমাদের খবর নিতে। উপরের খোলা বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়েছিল লাবণ্য। বললে, মা গেছেন রান্নাবাড়ীতে—

শিবু এ সংবাদে তখনই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, রান্না-বাড়ীতে? কেন, দু'দুজন বামুন রয়েছে, তারা করে কি? এক একজন বামুন কত মাইনে নেয়, জানো লাবণ্য? চল্লিশ টাকা। আমার বাড়ীতে ঝি-চাকরের মাইনে, চুরি আর খাওয়া-পরায় মাসে হাজার টাকা লাগে!

লাবণ্য সহাস্যে চোখ কপালে তুলে বললে, হাজার টাকা!

হ্যাঁ, হাজার টাকা! ওরা যদি কাজ করতে না চায়, তোমরা জুতিয়ে কাজ আদায় করে নেবে! দাঁড়াও—দেখছি আমি—

লাবণ্য বললে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না—মা তোমাকে আজ নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবেন, তাই গেছেন রান্নাবাড়ীতে—

এমন সময় একজন চাপরাশি একখানা ট্রে-তে এক টিন সিগারেট আর দেশলাই এনে দাঁড়ালো। শিবু সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললে, খুড়িমা আমাকে খাওয়াবেন, আমার কী ভাগ্যি!

লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে বললে, মা গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করতে গেছেন! আচ্ছা শিবুদা, আমাদের থাকার জন্যও ত' তোমার অনেক

খরচ পড়ছে। হাজার টাকা হয়ত দেড় হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে,—তার চেয়ে আমাদের দেশে পাঠিয়েই দাও—

শিবু একমুখ হেসে বললে, কী আর খরচ! বোঝার ওপর শাকের আঁটি। এর জন্যে তোমরা ব্যস্ত হোয়ো না।

বাড়ীর এদিকের অংশটা নির্জন। এদিক-ওদিক চেয়ে শিবু বললে, তোমার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি, লাবণ্য।

কি?

একগাছা জড়োয়া নেকলেস পকেট থেকে বের করে শিবু বললে, তোমাকে এটা উপহার দিতে চাই।

নেকলেসটি দেখে লাবণ্য সোজা শিবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কেন?

শিবু বললে, এমনি—দিতে ইচ্ছে হোলো।

কত টাকা দাম?

ন'শো টাকা!

লাবণ্য বললে, ন'শো টাকার উপহার আমাকে দিয়ে কেন তুমি টাকা নষ্ট করবে?

শিবু বললে, এটা নষ্ট হবে জানলে দিতুম না। তুমি গলায় পরলে মানাবে, তাই এনেছি।

কলকাতায় অনেক মেয়ে আছে! আমার গলায় নেকলেস ঝুলিয়ে তোমার লাভ কি বলো ত?

কঠিন শীতল লাবণ্যের কণ্ঠস্বর। তার চাহনি এত পরিষ্কার যে, মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শিবু অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়ে বললে, তুমি নেবে না?

লাবণ্য বললে, মাকে জিজ্ঞেস না করে নিতে পারবো না।

শিবু বললে, তবে থাক্—খুড়িমাকে বলবার দরকার নেই। এই বলে হার ছড়াটা সে পকেটে পুরে রাখলো।

লাবণ্য বললে, তুমি এখানে বিশ্রাম করো শিবুদা, আমি মাকে একবারটি দেখে আসি।—এই বলে সে চলে গেল।

কেমন একটা কঠিন উত্তেজনা শিবুর দুই চোখে কাঁপতে লাগলো। ওদের বাড়ীতে সে ভাত খেয়ে মানুষ, ওদের চোখে সে অশ্রদ্ধেয়, ওদের সমাজে সে নগণ্য,—এই অপমানজনক ইঙ্গিতটি যেন লাবণ্যর ওই প্রতি-পদক্ষেপে সুস্পষ্ট। এ বাড়ীতে এসে ওরা যেন শিবুকে কৃতার্থ করেছে, ওরা শিবুর অন্নগ্রহণ করে শিবুকে যেন গৌরবমণ্ডিত করেছে।

শিবু কেবল ভাবতে লাগলো কত টাকা খরচ করলে ওদের চিত্তের প্রসন্নতা জয় করা যায়! লাবণ্যর দাম কত টাকা!

* * * * *

এ বাড়ীতে শিবু একা—এ বাড়ী তার নিজস্ব। আপনার লোক বলতে তার কেউ নেই; বিবাহের জন্যও সে ব্যস্ত নয়। বাড়ীর একটা অংশ শুধু বাইরের লোকে পরিপূর্ণ। সাহেবেরা এসে চা খায়, ঠোঁটে রং-মাখানো মেয়েছেলে মাঝে মাঝে আসে, খাকি পোষাকপরা মেজর ও লেফটেন্যান্টকেও দেখা যায়। এ ছাড়া বন্ধু-বান্ধব,—কিন্তু তারা বহু রকমের। কেউ ঘোড়-দৌড়ের মাঠের জুয়াড়ী, কেউ দালাল কেউ সাব-কণ্ট্রাক্টর, কেউ মাড়োয়াড়ী-ভাটিয়া। শিবু কিন্তু একা —একা থাকে মরুভূমিতে। তবু তার টাকা যখন আছে, সে সম্রাট। রুই-কাৎলা এখানে যারা আসে, শিবু তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তারা আসে টাকার গন্ধে; ভালোবাসার জন্য নয়। শিবু সবাইকে টাকায় শাসন করে।

লাবণ্য এসেছে বটে তার বাড়ীতে। কিন্তু শিবুর কোনো উদ্বেগ নেই সেজন্য। লাবণ্যর প্রতি সে অনুরক্ত,—এ নিয়ে চিন্তাবিলাস করার সময় তার নেই। লাবণ্য সুশ্রী, লাবণ্য স্বাস্থ্যবতী,—তার জন্য শিবুর [illegible] দুশ্চিন্তা নেই। লাবণ্যকে সে যদি না পায়, কিছু যায় আসে না; যদি পায়, এমন কিছু বড় পাওয়া তার হবে না। পেলে মন্দ নয়, না পেলে দুঃখ নেই। মেয়েদেরকে ভালোবাসার এবং তাদের কাছ থেকে ভালোবাসা পাবার জন্য একটি শোভন স্বভাবের প্রয়োজন,—সেখানে তার দারিদ্র্য স্বীকার করতে হবে। ভালোবাসার জন্য সংস্কৃতি ও মহৎ শিক্ষার দরকার—সেটা কোথায় তার? সে তার জীবনে জানে দুটি জিনিষ—অনটন ও সচ্ছলতা। সে চরম দারিদ্র্য দেখে এসেছে এতকাল, এবার দেখছে পরম সৌভাগ্যসম্পদ। এর মধ্যে আর কোথাও কিছু নেই। কাকে বলে সৌজন্যবোধ আর সমাজ-বুদ্ধি, কাকে বলে বিদ্যা অথবা মহৎ জ্ঞান, কাকে বলে প্রেমের করুণ মধুর সাধনা,—ওসব বড় বড় কথা, ওসব পথে সে কোনো কালেই হাঁটেনি! ওসব তলিয়ে ভাববার সময়ও তার নেই।

খুড়িমা সেদিন বললেন, এই ত কতদিন হয়ে গেল, বেশ বেড়িয়ে নিলুম, তোমার কলকাতায়, মোটরে চড়ে হাওয়া খেলুম, সিনেমা দেখে এলুম—বেশ কাটলো। এবার কবে আমরা যাবো শিবু, বল ত বাছা?

শিবু হেসে বললে, যাবেন কেমন করে? বলু যে চাকরি করছে?

খুড়িমা বললে, আমার চোখে ধূলো দিসনে শিবু,—ওইটুকু ছেলে কোন কাজই জানে না, তুই ওকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দেবার ফন্দি এঁটেছিস,—সত্যি কিনা বল্ ত?

শিবু বললে, সত্যিই কি যেতে চান খুড়িমা?

ওমা, ছেলের কথা শোনো। ঘর-দোর সব ফেলে রেখে এসেছি, তাড়াতাড়ি না গেলে যে দরজা-জানলাগুলো খুলে নিয়ে যাবে রে!

আমি যদি আপনাদের কলকাতায় থাকার সব ব্যবস্থা করে দিই?

তোর এখানে?

শিবু বললে, না, অন্য বাড়ীতে।

খুড়িমা বললেন, তোর এত আগ্রহ কেন শিবু?

শিবু থতমত খেয়ে কোনো জবাব সহসা খুঁজে পেলো না। একটু সামলে বললে, তোমাদের জন্যেই বলছি খুড়িমা। সেখানে তোমরা যেভাবে থাকো, তাতে ভাবনার কারণ আছে। তা ছাড়া আজকাল পাড়াগাঁয়ের যা অবস্থা! কিছুতেই ভালোভাবে থাকা যায় না।

খুড়িমা তখনকার মতো চুপ করে গেলেন।

শিবু ফিরে আসছিল, বারান্দার সঙ্কীর্ণ একটা পথে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা। লাবণ্য হাসিমুখে বললে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ওসব কী আনিয়েছ আমার জন্যে?

শিবু হাসিমুখে বললে, ওসব আজকাল সবাই ব্যবহার করে।

লাবণ্য বললে, তাই বলে আমাকেও ঠোঁটে গালে রং মাখতে হবে, মুখখানায় পাউডার ঘষতে হবে—কেমন? এত শিখলে কোথায় শুনি? আমি কিন্তু ওসব মেখে তোমার সঙ্গে বেরোতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি।

শিবু বললে, তোমার বয়স কম হলে মল গড়িয়ে দিতুম।

লাবণ্য বললে, এখন বুঝি পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে চাও?

শিবু হেসে বললে, চলো, এরপর টিকিট পাওয়া যাবে না—গাড়ী অপেক্ষা করছে।

চলো, আমি তৈরী—বলে লাবণ্য প্রস্তুত হোলো।

শিবু বললে, না, তা হবে না,—তোমার জন্যে কুড়ি টাকা দিয়ে রেশমী শ্লিপার আনিয়েছি, ওটা পায়ে দিয়ে যেতেই হবে।

লাবণ্য কি যেন কতক্ষণ ভাবলো, তারপর বললে, আচ্ছা, তাই হবে—চলো।

শিবু আজ তার ছোট মোটরটি নিজেই হাঁকিয়ে চললো। পাশে বসেছে লাবণ্য। শেষ পর্যন্ত লাবণ্য তার মাকে লুকিয়ে একটুখানি টয়লেট করে এসেছে। অবিশ্যি এটা এমন কিছু অপরাধ নয়। একটা কথা লাবণ্য বুঝতে পেরেছে, শিবুকে অকারণ আহত করাটা তার পক্ষে সঙ্গত নয়। বাস্তবিক, শিবু ত অনেক করছে তাদের জন্যে। নিঃস্বার্থ এবং নিস্পৃহ ভাবেই করছে,—তার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করবার কিছু নেই। আর যাই হোক, শিবুর প্রতি অবিচার করায় কোনো আত্মগৌরব নেই।

এক সময়ে লাবণ্য বললে, তোমার নেকলেসটা আমি নিতে পারিনি, তুমি খুব দুঃখ পেয়েছিলে, না শিবুদা?

শিবু বললে, কই না, সেটা আমি ব্ল্যাক-মার্কেটে বেচে তিনশো টাকা লাভ পেয়েছি। তুমি আর একটা চাও?

টয়লেট-করা লাবণ্যর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে এলো অপমানে। শুধু বললে, আর তুমি কিছু আমাকে দিয়ো না।

শিবুর কোনো দুঃখ নেই, কারণ তার হৃদয় নেই। লাবণ্য যদি মনে করে থাকে, শিবু তার প্রতি আসক্ত,—লাবণ্য ভুল করেছে। শিবুর মনে কোনো সুদূর অনুরাগও নেই,—প্রণয়মাধুর্যরসে কেউ আনন্দ ও স্বপ্নময় হয়ে ওঠে, এ বস্তু তার কল্পনার অতীত! নারীর সঙ্গে তার জীবনে কোনদিনই বোঝাপড়া নেই। ওটা তার আসে না।

সিনেমায় ঢুকে অন্ধকারে খুঁজে তারা পাশাপাশি দুটো সীটে এসে বসলো। কি ছবি, তা শিবু জানে না, দরকারও নেই। সিনেমায় এসেছে, এই যথেষ্ট। দুজনে বসলো পাশাপাশি—কিন্তু মাঝখানে কি দুস্তর ব্যবধান। দুজনে গায়ে গায়ে, পায়ে পায়ে,—কিন্তু দুইখণ্ড ঠাণ্ডা পাথর! লাবণ্য জানে, এটা ক্ষণস্থায়ী; শিবু জানে এটা খেয়াল। শিবুর টাকা আছে, দামী সীট কিনেছে, মোটর আছে সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি সুসজ্জিতা তরুণী হোলো মানানসই। এই তরুণীটি যদি লাবণ্য না হয়ে মিস্ মলি রায় কিম্বা লীনা স্ট্যানহোপ হোতো—কিছু মাত্র মনোবৈকল্য হোতো না। ওরা যে-কেউ হোলো প্রয়োজনের সামগ্রী; টাকা, মোটর, টেলিফোন আর স্বাধীন প্রাসাদ হলেই ওরা আসে; সময়মতো আবার ওরা চলে যায়। শিবু কখনও ভুল করেনি।

অন্ধকারে একখানা হাত উঠে এলো লাবণ্যর ঘাড়ের কাছে। ঘামে তার গ্রীবা সিক্ত এবং শীতল। লাবণ্য চমকে উঠলো, তারপর আস্তে আস্তে হাত তুলে শিবুর হাতখানা অতি ধীরে সরিয়ে দিল। পুরুষ জানিয়ে দেয়, এই হাতখানা কাঁধে তুলে দেবার তাৎপর্য কি; নারীও জন্ম থেকে জানে ওই হাতখানার ভাষা! অন্ধকারে আড়ষ্ট হয়ে লাবণ্য নিঃশব্দে ছবি দেখতে লাগলো।

সেদিন ওই পর্যন্ত। কিন্তু সিনেমা ভাঙার পর বাইরে আসতেই দুইজন বন্ধুর সঙ্গে শিবুর দেখা। তাদের সঙ্গে একটি মেয়ে। ওদের দেখে শিবুর চেহারা গেল বদলে। অত্যন্ত উৎসাহে সে লাবণ্যর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। লাবণ্য যেন বাঁচলো এবার।

সবাই গেল নিউ মার্কেটে। সকলের পকেটেই তাড়া তাড়া নোট। পছন্দসই সামগ্রী জড়ো হোলো অজস্র। ওদের সকলেই টাকার মানুষ, টাকা খরচ করতে ওরা জানে। তিনটি ছেলে, আর দুটি মেয়ে

তাদের সঙ্গে। অতঃপর ঘণ্টা তিনেক ধরে তাদের সঙ্গে নিয়ে শিবু কলকাতার পথে পথে টাকা ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলো।

ফিরবার পথে আবার সেই মোটরে দুজন নিঃসঙ্গ। কলকাতার পথে তখন আলোকনিয়ন্ত্রণ-বিধি বলবৎ রয়েছে। এক অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে তাদের মোটর চলেছে। লাবণ্য বসে রয়েছে চুপ করে শিবুর পাশে। শিবু সহজ, তার মনে প্রণয়ের ধোঁয়া নেই, রস-কল্পনার প্রলাপ নেই। ছোট লাহিড়ীর এই মেয়েটার স্বাস্থ্যটা সে চায়—এই নধর হৃষ্ট-পুষ্ট স্বাস্থ্যটা। লাবণ্য সহজ নয়, তার গ্রীবায় শিবুর সেই হাতের স্পর্শ এখনও ফোসকার মতো জ্বালা করছে। ওই হাতখানার বক্তব্য কিছু সে বুঝেছে, কিছু বোঝেনি। যে-অংশটা বুঝতে পারেনি, সেইটির জন্য সে উৎসুক। এক সময়ে সে ডাকলো, শিবুদা?

লাবণ্যর অহঙ্কার অনেকটা কমে এসেছে; তার আভিজাত্যবোধের উগ্রতা—তাও কোমল হয়ে এসেছে। এটা শিবুর কাছে নতুন নয়, সে এসব জানে—এমনিই হয়। মেয়েদের প্রাথমিক উগ্র অহঙ্কার আর ক্রুদ্ধ প্রতিরোধ এক সময় কমে আসে,—তাদেরকে আত্মসমর্পণ করার সময় দিতে হয়। লাবণ্য ন'শো টাকার নেকলেস গ্রহণ করেনি, এর পর নয় টাকার সেফ্‌টিপিন পেলে আহ্লাদে আটখানা হবে। এটা শিবুর ব্যক্তিগত নারীদর্শন, এখানে সে ভুল করে না। সে স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল, কেন, কি বলছ?

লাবণ্য ~~বললে, না~~, কিছু না—বাড়ী আর কতদূরে?

এই যে—বলে শিবু ক্যাঁচ করে মোটরের গতি কমিয়ে তার বাড়ীর ফটকের মধ্যে গাড়ী ঢুকিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করালো।

দুজনে নামলো, তারপর শিবু ইচ্ছাপূর্বক লাবণ্যর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে ভিতরে চললো।

রাত এগারোটা বেজে গেছে। লাবণ্য ভুলে গিয়েছিল পল্লীজননীর উদ্বেগের চেহারাটা। সহসা অন্ধকার বারান্দাপথের একপ্রান্ত থেকে খুড়িমা বলে উঠলেন, এ কি, শিবু, লাবণ্য—এর মানে?

চকিতে দুজনের হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। লাবণ্য নতমুখে বললে, ফিরতে একটু দেরী হোলো, মা।

হুঁ—খুড়িমা বললেন, শিবু, এই কি তোমার মতলব ছিল?

শিবু স্পষ্ট উত্তর দিল, কেন, খুড়িমা?

কেন? খুড়িমা তীব্র রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, তোমার ভয়-ডর নেই, আমার মেয়ের গায়ে তুমি হাত দাও?

কোনো দোষ করিনি, খুড়িমা!

খুড়িমা রাগে ও উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার বাড়ীতে এসেছিলুম,—মান খোয়াতে আসিনি! খবরদার শিবু,—আমি সাবধান করে দিচ্ছি,—খবরদার—কাল আমরা চলে যাবো তোমার বাড়ী থেকে, কিন্তু যাবার আগে তুমি আমাদের ত্রিসীমায় আসবে না—

লাবণ্য ঘরে গিয়ে ঢুকে ঠক-ঠক করে কাঁপছিল, এবার তার মা দ্রুতপদে ভিতরে এলেন।

শিবু দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধকারে হাসিমুখে। কোন চাঞ্চল্য তার মুখে-চোখে ছিল না। সে কেবল ভাবতে লাগলো, খুড়িমার অসন্তোষের গভীরতা কতখানি এবং কতগুলি টাকা খরচ করলে সেই অসন্তোষটুকুর ওপর প্রলেপ দেওয়া যায়। এটা তার একটুখানি সাধারণ অভিজ্ঞতা মাত্র, তার কৌশল-বুদ্ধির সামান্য ত্রুটি—আর কিছু নয়। এটাকে অর্থব্যয়ে অতিক্রম করা দরকার, কেননা লাবণ্যর সঙ্গে তার বোঝাপড়া এখনও শেষ হয়নি।

সে রাত্রে শিবুর একটুও ঘুমের ব্যাঘাত হোলো না।

* * * * * *

পরদিন খুড়িমা চলে যাবেন বটে, কিন্তু দেশে রওনা হবার খরচপত্র ছিল না। সারাদিন তিনি শিবুর অনুগ্রহের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন, তারপর সন্ধ্যার দিকে বলুকে বাইরের দিকে খবর আনতে পাঠালেন। বলু ফিরে এসে সংবাদ দিল, শিবুদা এইমাত্র ফিরেছে, কিন্তু তার মোটর-দুর্ঘটনা হয়েছে, আপিস-বাড়ীর ঘরে তিনি শুয়ে রয়েছেন।

বাঙালী মাতৃহৃদয় একটুখানি কেঁপে উঠলো। তিনি ভাবলেন, তবে কি তাঁর অভিশাপ লাগলো শিবুর? অনুশোচনায় খুড়িমার গলার আওয়াজ প্রসন্ন হয়ে এলো। বললেন, ওমা, জলজ্যান্ত ছেলে,—খুব লাগেনি ত?

বলু বললে, সেখানে অনেক লোক ঘিরে রয়েছে।

লাবণ্য উৎকণ্ঠিত হয়ে এক সময় বললে, বলু তুই মার কাছে থাক, আমি স্নান করে আসি।—এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

ঝি দাঁড়িয়ে থাকে বাথরুমের কাছে ফরমাস খাটার জন্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঝি বললে, দিদিমণি, বাবু আপনাকে একবার ডেকে পাঠালেন। দু'মিনিটের জন্যে।

লাবণ্যর সর্বশরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠলো। সেও এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে বললে, চলো।

শিবুর ঘরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা লাবণ্যকে আসতে দেখে বেরিয়ে চলে গেল। লাবণ্য এসে ঢুকলো শিবুর ঘরে। বিছানায় শুয়ে শিবু হাসিমুখে চুপি চুপি বললে, আমার কিছু হয়নি লাবণ্য, শুধু খুড়িমাকে যেতে দেবো না।

লাবণ্য স্তম্ভিত হয়ে বললে, কেন শিবুদা !

শুধু তোমার জন্যে। বসো এইখানে।

লাবণ্য বললে, কিন্তু মাকে লুকিয়ে আমি এসেছি।

শিবু বললে, তা আমি জানি,—লুকিয়ে তোমাকে আসতেই হবে। সবাই লুকিয়েই আসে।

লাবণ্য তার পাশে বসলো মোহাবিষ্টের মতো। শিবু হাত বাড়িয়ে লাবণ্যের একখানা হাত টেনে নিয়ে বললে, তুমিও যেতে চাও ?

লাবণ্য বললে, হ্যাঁ, মা গেলে আমাকেও যেতে হবে। ওকি, হাত ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে।

শিবু বললে, কেউ আসবে না তুমি এখানে থাকতে।

লাবণ্য বললে, আমি যে স্নানের নাম করে এসেছি।

শিবু বললে, খুড়িমাকে আমি জানিয়ে দেবো, আমি শয্যাগত। তুমিও চেষ্টা করো আর কয়েকদিন থাকতে—কেমন ?

লাবণ্য বললে, আমাদের বেঁধে রাখতে চাও কেন তুমি ?

শিবু হাসিমুখে তাকালো লাবণ্যর দিকে। বললে, বরফটা এখনও সম্পূর্ণ গলেনি, তাই জন্যে। তোমার যাবার সময় এখনও হয়নি, লাবণ্য।

লাবণ্য চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালো। শিবু শেষবারের মতো তার হাতখানা টেনে একটু চাপ দিল। পরমুহূর্তে হাতখানা ছাড়িয়ে লাবণ্য ঘর থেকে বেরিয়ে হন হন করে চলে গেল।

দিন দুই কেটে গেল। খুড়িমা এখনও শিবুর মুখ দর্শন করেননি। কিন্তু তাঁর কানে উঠলো, খুব অসুস্থ, শয্যাগত—তার বুকে আঘাত লেগেছে, হৃদস্পন্দনের গণ্ডগোল ঘটছে। ডাক্তার আনাগোনা করে।

দিনচারেক পরে খুড়িমা শিবুর ঘরে এসে ডাকলেন, শিবু।

শিবু চোখ মেলে তাকালো, তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। বললে, আমার যাই হোক খুড়িমা—কিন্তু তোমাদের মানসম্ভ্রম, তোমাদের ইজ্জত,—আমার এই বাড়িখানার চেয়ে অনেক উঁচু। আর লাবণ্য! লাবণ্য যে বংশের মেয়ে, আমি তার পায়ের তলায় থাকারও যোগ্য নয়। লাবণ্য কোন অন্যায় করে নি, করতে পারে না, খুড়িমা। আমি তোমার ভাতে মানুষ, তোমার পায়ের ধূলো—কিন্তু লাবণ্য যেন তোমার চোখে ছোট না হয়।

খুড়িমা বললেন, তুই কেমন আছিস বাবা?

বুকে ভারি ব্যথা, ডাক্তার ভয় পাচ্ছিলেন—তবে—

খুড়িমার মনের মেঘ অনেকটা কেটে গেছে। কাটবে, একথা শিবু জানতো। তিনি এক সময় প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন। তার পিছনদিকে তাকিয়ে শিবু বক্র তীক্ষ্ণ হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে এবার পাশ ফিরে শুলো।

আরও দু-চার দিন পরে বলু সেদিন মায়ের কাছে এসে একরাশি টাকা নামিয়ে দিল। খুড়িমা বললেন, কিসের টাকা রে?

বলু বললে, বাঃ আমি যে আজ মাইনে পেলুম?

মাইনে! এত টাকা? এত টাকা মাইনে পেলি তুই?

খুড়িমা অভিভূত আবিষ্ট হয়ে রইলেন। সেদিন সামান্য কয়টা টাকার জন্য তিনি এ বাড়ী থেকে চলে যেতে পারেননি, কিন্তু আজ বলুর উপার্জন হাতে নিয়ে তাঁকে ভাবতে হোলো, দেশে ফিরে গেলে এ টাকা তাঁর বন্ধ হবে। সেখানে তিনি আত্মসম্মান, আভিজাত্যবোধ এবং নিজের গর্ব নিয়ে অবশ্যই থাকতে পারবেন,—কিন্তু উপবাস করে থাকতে হবে। সেখানে কাপড় নেই, নুন নেই, চাল নেই, ওষুধ নেই,—পল্লীজীবনটা এখন কেবল একটা বিরাট শূন্য! সেটা অন্ধকার

পল্লীগ্রাম, সেখানকার যুদ্ধ ইউরোপ ও এশিয়ার যুদ্ধের চেয়ে অনেক বড়, অনেক বিরাট,—কারণ সেটা দৈনন্দিন অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম। তার আদি অন্ত নেই।

এমন সময় একজন চাকর এসে শিবুর হাতের লেখা দু-লাইন চিঠি দিয়ে গেল। শিবু লিখেছে, বলু আমার ছোটভাইয়ের মতন, কিন্তু তার জন্য আমি গর্ববোধ করছি। আমি জানি সে বুদ্ধিমান, সে উন্নতি করবে। আপনি কি যাবার দিন স্থির করেছেন, খুড়িমা? কিছুতেই কি আর থাকা সম্ভব নয়?

খুড়িমা স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

লাবণ্য ডাকলো, মা?

মা বললেন, কেন?

লাবণ্য বললে, দেশে যাওয়া মানে ত' সেই না খেয়ে মরা!

ছোট-লাহিড়ীর স্ত্রীর আভিজাত্য বোধ ফণা উঁচিয়ে উঠলো। বললেন, তুই কি এখানে থেকে মানসম্ভ্রম সব খোয়াতে চাস? ধর্ম নেই, ইজ্জৎ নেই? বংশের নাম নেই?

লাবণ্য শান্তভাবে বললে, সেখানে গিয়ে না খেয়ে মরলে মান বাঁচবে তোমার? একখানা ছেঁড়া কাপড়ও যদি না পাও, ধর্ম বাঁচবে? ভিক্ষেও যদি না জোটে, বংশের নাম রাখতে পারবে?

খুড়িমা লাবণ্যর দিকে একবার তাকালেন। লাবণ্যর পরণে একখানা ক্রেপ-বেনারসী শাড়ী, গায়ে ব্রোকেডের ব্লাউস, পায়ে রেশমী চটি, দুই কানে পোকরাজের দুল দুলছে; কিন্তু যাবার সময় শিবুর দেওয়া এ সমস্ত আভরণ আর পরিচ্ছদ ছেড়ে রেখে যেতে হবে। তিনি বললেন, তুই কি বলতে চাস, লাবণ্য?

লাবণ্য মায়ের দিকে তাকালো। মায়ের পরণে গরদের থান,

আর গরদের জামা। মা বসে রয়েছেন একটি কুশনে, মাথার উপরে ঘুরছে ইলেকট্রিক পাখা। এক মাসে মায়ের স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। লাবণ্য পলকের জন্য আত্মসম্বরণ করে বললে, ধরো যদি আমি কলকাতায় কোনো একটা কাজ পাই,—তবে ভাই-বোনে চালাতে পারবো না?

মা বললেন, লাহিড়ী বংশের মেয়ে চাকরি করে পেট চালাবে?

পেটের দায়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে চাকরি করা ভালো। ভিক্ষের চেয়ে ভালো, চুরির চেয়ে ভালো।

তুই কি এই বাড়ীতে থাকার কথা বলছিস?

না, আমরা ঘর ভাড়া করবো। নিজের মান নিজে রাখতে জানলে খোয়া যায় না, মা!

মা বললেন, কিন্তু দেশে সব পড়ে থাকবে?

কি আছে সেখানে? লাবণ্য বললে, ভাঙা দুটো বাক্স, মাটির হাঁড়ি-কলসী, ছেঁড়া কাপড় এক আধখানা, ময়লা দুর্গন্ধ বিছানা। আর বাড়ী? দুখানা খড়ের চালা,—বৃষ্টি নামলে সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়! বাড়ীর দিকে তাকালে চোরেরাও মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়।

শিবু সেরে উঠলো, কেননা ঠিক সময় তাকে সেরে উঠতেই হবে। আর শুয়ে থাকলে তার চলবে না। সে মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল, তার অনেক কাজ। সন্ধ্যার দিকে ফিরে সে গিয়ে খুড়িমার কাছে দাঁড়ালো। বললে, লাবণ্যর জন্যে একটা কাজ সন্ধান করেছি, খুড়িমা—

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, সেটা কি তোমার আপিসেই?

না, সেটা সরকারী কাজ। তবে আমাকে সুপারিশ করে দিতে হবে। কাল সকালে লাবণ্য সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে।

কিন্তু লাবণ্য ইংরেজি জানে না।

শিবু বললে, যেটুকু জানে তাতেই চলবে, আমি বলে দেবো।

খুড়িমা বললেন, অত বড় মেয়ে রোজ যাবে চাকরি করতে! সেখানকার সাহেবরা কেমন লোক, শিবু?

শিবু হাসিমুখে বললে, অন্তত আমার চেয়ে ভালো, খুড়িমা।

যদি লাবণ্যর চাকরি হয়, তবে আমরা গিয়ে অন্য জায়গায় থাকবো, এ তোমাকে জানিয়ে রাখলাম, শিবু।

শিবু জানিয়ে দিল, আপনি যা স্থির করবেন, তাই হবে খুড়িমা।

খুড়িমা স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। শিবু আস্তে আস্তে চলে গেল।

পরদিন শিবুর মোটরেই লাবণ্য বেরিয়ে পড়লো। কী একটা ক্রুর উল্লাস শিবুর মুখে-চোখে। লাবণ্যর সেই আত্মাভিমান আর আভিজাত্য-বোধ কোথায় গেল? শিবুকে সে আর আঘাত করতে চায় না, শিবুর শিক্ষাহীনতা নিয়ে কঠোর বিদ্রূপ করে না। টাকার কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে, মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরের কাছে সে নারীর আত্মমর্যাদাকে আনত করেছে—শিবুর কী উল্লাস! ছোটলাহিড়ীর ভাত খেয়ে সে মানুষ,—কী জঘন্য সেই আত্মগ্লানি! যারা তাকে হীন অবজাত মনে করতো, তাদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করায় কী আনন্দ! অনুগ্রহ প্রকাশ করায় কী গৌরব! দান গ্রহণ করানোয় কী নিবিড় পরিতৃপ্তি!

গাড়ী চলছে। লাবণ্য বললে, কোথায় তোমার সাহেবের আপিস?

শিবু হেসে বললে, আমাকে তুমি এখনও বিশ্বাস করো লাবণ্য?

লাবণ্য তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে, মানে?

শিবু বললে, লোকে চাকরি করে কেন, বলতে পারো?

লাবণ্য বললে টাকার জন্যে!

কিন্তু টাকার অভাব যদি তোমার না হয়?

তুমি দান করবে?

দান না ক'রে যদি তোমার দাবী মেটাই?

লাবণ্য প্রশ্ন করলো, তোমার কাছে কিসের দাবী আমার?

শিবু বললে, কোন্ দাবীতে তুমি পাঁচশো টাকার দুল্ পরেছ কানে, আড়াইশো টাকার জামা কাপড় পরেছ?

লাবণ্য বললে, তুমি দিয়েছ তাই—

আমি দিইনি, তুমি পেয়েছ। পাবার অধিকার আছে তোমার এখনও অনেক পাবে। আমার বাড়ীখানার দাম দেড় লক্ষ টাকা, আমার ব্যাঙ্কে আছে বারো লক্ষ, আমার কারবার চলছে দশ লক্ষ টাকার। শিবু একে একে সব বলে ফেললে।

অধীর উত্তেজনায় লাবণ্য কাঁপছে। শিবু যেন চারিদিক থেকে সহস্র বাহু দিয়ে তাকে নিপীড়িত ক'রে বাঁধতে চাইছে। সে যেন ছুটে পালাতে না পারে, যেন আর্তনাদ না করে। লাবণ্যর গলা শুকিয়ে উঠলো। বললে, তুমি আমাকে এত দিতে চাও কেন?

শিবু হঠাৎ হা-হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। লাবণ্য কেঁপে উঠলো।

গাড়ীখানা এসে ঢুকলো এক বাগান বাড়ীতে। তখন মধ্যাহ্নকাল।

শিবু বললে, ভয় পেয়ো না, এ বাগানটা সেদিন আমি কিনেছি, সত্তর হাজার টাকায়।

লাবণ্য বললে, কে আছে এখানে?

কেউ নেই। কেবল মালী থাকে ওই আমতলার ওদিকের ঘরে।

আমাকে এখানে আনলে কেন?

শিবু বললে, ওপরতলাটা কেমন সাজিয়েছে তোমায় দেখাবো, নেমে এসো।

দুজনে নেমে বাগান পেরিয়ে দোতালায় উঠে গেল। অদূরে নিম-গাছের ডগায় একটা ডাহুক তখন উচ্চ দীর্ঘকণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

প্রচুর অর্থব্যয়ের চিহ্ন চারিদিকে থরে থরে সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখা গেল, দুই পাশে অসংখ্য মূল্যবান ছবি। বিশ্বামিত্র ও উর্বশী, অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার অরণ্য প্রণয়, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনী দল,—ইত্যাদি। দোতলার প্রকাণ্ড হলে ইতালীয় চিত্রাবলী, এডমণ্ড ডুলাকের নামজাদা ছবিগুলো, রাণী ইউজিনির সভাচিত্র, ফ্লোরেন্সের মেয়েরা, মধ্যযুগের নাইট এরান্ট, দান্তে ও বিয়াত্রিচে! বিভিন্ন প্রকার রোমাঞ্চকর ছবি ঝুলিয়ে যেন সমস্ত দোতলাটায় নরনারীর মনের একটি বিশেষ বক্তব্যকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

লাবণ্য আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। শিবু বললে, কেমন লাগছে?

লাবণ্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

সন্ধ্যার সময় দুজনে গাড়ী নিয়ে ফিরে এলো। লাবণ্য অজস্র কথা বলতে বলতে এসেছে সমস্ত পথটায়—অধ্যবসায়ে আর উৎসাহে। ওর মধ্যেই শিবুকে সে উপদেশ দিয়েছে কত রকমের। শিবু যেন অত পরিশ্রম না করে, শিবুর স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে। শিবুর পাশে ব'সে লাবণ্য কত প্রলাপোক্তি করলো, কতবার তা'র পিঠে আর ঘাড়ের কাছে লাবণ্য নিজের হাতখানা রাখলো। শিবু মনে মনে হেসেছে। ছোট-লাহিড়ীর সেই আত্মগর্বী মেয়েটা অনেক নীচে এবার নেমে এসে তা'র পা দুখানা যেন লেহন করছে। শিবুর আর কোনো বক্তব্য নেই।

এবার সাবধানে অনেকখানি দূরত্ব মাঝখানে রেখে শিবু আর লাবণ্য ছোট-লাহিড়ীর আভিজাত্যাভিমানী পরিবারের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, খুড়িমা, লাবণ্যর এ চাকরিটা হোলো না।

খুড়িমা বললেন, হোলো না?

না, চাকরি পাওয়া লাবণ্যর পক্ষে সম্ভব নয়!

তা'র গলার আওয়াজ শুনে লাবণ্য একটু চম্‌কে ফিরে তাকালো। শিবু বললে, আমি ভেবে ঠিক করেছি, আসছে কাল আপনাদের দেশেই ফিরে যেতে হবে; এদিকের ব্যবস্থা আমি সব ক'রে দেবো।

খুড়িমা বললেন, তুমি বলছ তোমার এ-বাড়ীতে আমাদের আর থাকা চলবে না?

লাবণ্য সহসা অধীর উত্তেজনায় কাঁপছে। কটাক্ষে তা'র দিকে একবার তাকিয়ে শিবু বললে, আপনি থাকবেন এ আমার সৌভাগ্য, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি আপনাদের থাকা নিয়ে নানা কথা উঠেছে।

লাবণ্য আর্তনাদ ক'রে উঠলো, তোমার একথার মানে কি, শিবুদা?

শিবু শান্তকণ্ঠে বললে, বলুও আমার এখানে সুবিধে করতে পাচ্ছে না,—ছেলেমানুষ ত বটে! ও আর কতটুকু কাজ জানে!

খুড়িমা বললেন, সে ত' বটেই। তা হ'লে আমাদের যাওয়াই স্থির হোলো?

শিবু হাসিমুখে বললে, আপনিও যাবো যাবো করছিলেন ক'দিন,—সেই ভালো। তা ছাড়া দেশের বাড়ী খালি পড়ে রয়েছে,—আপনার শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যেয় আলো জ্বলবে না, সেটাও আপনার পক্ষে দুঃখের কথা খুড়িমা।

লাবণ্য দুই চোখে আগুন ঠিকরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, থাক, অনেক

হয়েছে। চোরের মুখে ধর্মের কাহিনী শুনতে চাইনে। তুমি মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, প্রতারক! কিন্তু একথা তোমাকে ব'লে রাখি, কলকাতাটা তোমার একার নয়।

খুড়িমা বললেন, চেঁচাস কেন লাবণ্য? যা বলে শোননা মন দিয়ে?

না, না—তুমি জানো না, মা—একটা অতি সাংঘাতিক বিষক্রিয়ায় লাবণ্যর সর্বাঙ্গটা যেন মুচড়ে দুমড়ে উঠছিল!

শিবু অচঞ্চল কণ্ঠে বললে, তা ছাড়া আর একটা কথা। আপনি অত বড় মেয়ে নিয়ে কলকাতার অজানা কোন্ গলিঘুঁজিতে থাকবেন, সেটা ভালো দেখা যাবে না!

তুমি ঠিক বলেছ, শিবু। আমার দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত।

জড়িত অস্পষ্ট স্বরে ও-পাশ থেকে লাবণ্য বললে, বিশ্বাসঘাতক!

খুড়িমা এবার রাগ ক'রে বললেন, লাবণ্য, ছেলেটাকে কেন তুই মিছেমিছি গাল দিস্?

মিছেমিছি? তুমি ঠিক জানো? বেইমানকে তুমি বিশ্বাস করো মা?

শিবু হেসে বললে, মেয়ের চেহারা দেখছেন, খুড়িমা? ওর দোষ নেই। এ যুগের হাওয়া, কলকাতার জল! যাকৃগে, আমি আপনাদের যাবার খরচ একশো টাকা দেবো। আর যদি অনুমতি করেন তবে একটি অনুরোধ—

খুড়িমা বললেন, কি শিবু?

শিবু বললে, লাবণ্যর বিয়ের খরচ স্বরূপ আমি আপনার পায়ের কাছে হাজার পাঁচেক টাকা প্রণামী দিতে চাই!

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে খুড়িমা বললেন, তুমি যথেষ্টই দিলে বাবা, আর কিছু চাইবার রাখলে না।

এমন সময় একজন চাকর এসে জানালো, আপনাকে ফোনে ডাকছে! শিবু মুখ ফিরিয়ে বললে, কে ডাকছে? কোথেকে? চাকরটা বললে, নীলিমা রায়—বালীগঞ্জ থেকে—

শিবু বললে, তবে ওই কথাই রইলো, খুড়িমা। কাল আপনাদের এখান থেকে যাওয়া, বেলা দুটোর গাড়ী। সকালেই আমি সব টাকা পাঠিয়ে দেবো। তারপর আমাকে যেতে হবে একবার কলকাতার বাইরে।

খুড়িমার পায়ের ধুলো নিয়ে আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে শিবু চ'লে গেল। ওপাশে তখন লাবণ্য পাথরের মতো ব'সে আত্মগ্লানিতে, অনুশোচনায়, ক্লেদক্লিন্নতায় যেন একটা আদি অন্তহীন নরককুণ্ডের মধ্যে প'ড়ে অন্ধের মতো আঁকুপাঁকু করছে!

কল্পান্ত

ছোড়দিদির বাড়ীটা ছিল বেলেঘাটার শেষপ্রান্তে। এমন একটা ঠিকানা, যেটা খুঁজে বা'র করতে অমলকে বিশেষ বেগ পেতে হোলো। অমলের বন্ধু নৃপেন নাগপুর থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, তোরা যদি জাপানীদের ভয়ে নিতান্তই কল্‌কাতা ছেড়ে পালাস, তবে আমার ছোড়দি বেচারীকেও যেখানে হোক নিয়ে যাস, ও বেচারীর কেউ নেই।

অমল ভয় পায়নি, কিন্তু বাঙলার গভর্ণমেণ্ট ভয় পেয়েছিল। সিঙ্গাপুরের পতনের পরেই গভর্ণমেণ্ট কাঁপতে কাঁপতে জানালো, যারা কোনো সরকারী কাজ করে না, তারা পালিয়ে যাক্। সুতরাং লক্ষ লক্ষ লোকের মতন অমলও তার বাড়ীর লোকদের এখানে ওখানে সরাতে লাগলো। কেউ কাশী, কেউ পাটনা, কেউ বর্ধমান, কেউ বা রাণাঘাট।

নৃপেনের চিঠিতে ছোড়দিদির ঠিকানাটা ঠিকই ছিল, তবে সহর-তলীর গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে নাম-নম্বরহীন বাড়ীটি খুঁজে পেতে বেলা অনেক বেড়ে গেল। তখন শীতের শেষ।

বন্ধুর সহোদরাকে অমলও ছোটবেলা থেকে ছোড়দিদি ব'লে ডাকে। তবে এটা ছোড়দিদির শ্বশুরবাড়ী। এ বাড়ীতে সটান ঢোকবার আগে অমল বাইরে থেকে ডাকলো, কেউ আছেন নাকি?

ডাকাডাকি করতে করতে বছর পনেরো বয়সের একটি ফুটফুটে মেয়ে সন্তর্পণে দরজার কাছাকাছি এসে বললে, কে ?

আমি অমল, ছোড়দিদি আছেন ?

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। মেয়েটি হাসিমুখ বাড়িয়ে বললে, একি, অমল মামা, কী ভাগ্যি আমাদের ? আসুন ?

অমল ভিতরে ঢুকে বললে, কেমন আছিস তোরা টুনু ? এখনও পালাসনি ?

কোথায় পালাবো বলুন ? এপাড়ায় ত সবাই চলে গেছে। আমরা এখনও আছি, সন্ধ্যের পরে কী ভয় করে ?

ভয় কা'কে রে ?

কেন, চোরের ভয় ?

অমল বললে, পাগলি চোরের প্রাণভয় আরো বেশি,—তারাও পালিয়ে গেছে সকলের সঙ্গে।

টুনু হাসতে লাগলো।

এমন সময় মাথায় ঘোমটা টেনে ছোড়দিদি এলেন। তিনি বিধবা, বয়স আন্দাজ বছর পঁয়ত্রিশ হবে। তিনি শান্ত নম্র কণ্ঠে বললেন, এসো ভাই—দিদিকে মনে পড়লো ?

অমল নৃপেনের চিঠিখানা বা'র ক'রে বললে, আমাদের সঙ্গে সে আপনাকে যেতে বলেছে। নৃপেন খুব ব্যস্ত হয়েছে আপনাদের জন্য।

ছোড়দিদি প্রশ্ন করলেন, সবাই বুঝি পালাচ্ছ ? তোমার ভাই-বোনেরাও ?

অমল বললে, হ্যাঁ, এক একদলে এক একদিকে পালিয়েছে, তবে কাকা আর কাকীমা এখনও যাননি।

তোমার বাবা ?

অমল বললে, বাবা ত এখানে থাকেন না। মা মারা যাবার পর, থেকেই তিনি কাশী গিয়ে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারি করেন। আপনার এখানে আর কাউকে দেখছিনে যে? আপনার ভাসুর কই?

ছোড়দিদি নত নম্র মুখে বললেন, তিনি সপরিবারে চ'লে গেছেন নলহাটি। বড় তরফের ওঁরাও আজ আটদিন হোলো পালিয়ে গেছেন।

অমল বললে, আপনার দিদিশাশুড়ী আর রাঙ্গাদিদিরা?

তাঁরা ছেলেমেয়েদের সবাইকে নিয়ে গেছেন মালদা।

সহসা অমল একটু চাপা অভিমানে ফুলে উঠলো। বললে, নৃপেন আমাকে সবদিক ভেবেই লিখেছে। আচ্ছা ছোড়দিদি, সত্যি বলুন ত?

সস্নেহ শান্ত হেসে ছোড়দিদি বললেন, কি ভাই?

অমল বললে, এটা আপনার শ্বশুরের ভিটে, এখানে দাঁড়িয়ে কারো নিন্দে করতে চাইনে। কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি, আপনাকে ফেলে সবাই পালিয়েছে! আপনি বিধবা, সহায় সম্বল নেই, আপনি লোকের বোঝা।

ছি ভাই অমল, এসব কথা বলতে নেই!

কেন, বলবোনা ছোড়দি?—অমল বললে, আপনি হিন্দুঘরের বিধবা, পরের দয়ায় মেয়েটাকে খাইয়ে পরিয়ে আপনার দিন কাটে, আপনার জন্য পাঁচসের আলোচাল দিতে ওঁদের গায়ে লাগে, চিরদিন ওঁদের অনাচার আপনি মুখবুজে সইলেন—

অমল! থাক্ ভাই ওসব কথা!

অমল বললে, ছোড়দি আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলা আমার অধিকারের বাইরে, আপনি হয়ত পছন্দ করবেন না।

কিন্তু যাঁরা পালিয়ে গেল তাদের প্রাণের চেয়ে আপনার আর টুন্নুর প্রাণের দাম কি কম?

ক্ষোভে ও সমবেদনায় অমলের চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। ছোড়দিদি কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। সহসা এক সময়ে সহাস্য মিষ্টকণ্ঠে বললেন, তুমি একটা কথা ভেবে দেখনি ভাই, আমরা চলে গেলে এবাড়ী যে একেবারে খালি। এত বড় পুরোনো বাড়ী...দক্ষিণ দিকে পাঁচিল নেই···সন্ধ্যেয় আলো পড়বে না।—আমার গেলে চলবে কেন ভাই?

অমল বললে, কিন্তু একা এখানে থাকলে আপনার চলবে কেমন ক'রে ছোড়দি? তা ছাড়া টুন্নু এখন একটু বড় হয়েছে।

ছোড়দিদি বললেন, সেই জন্যই আরো কোথাও যেতে সাহস নেই ভাই। এত বড় মেয়ে নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াতে যাবো বলো? বরং ভাত কাপড় না জোটে, নিজেদের পড়ো ঘরখানার মধ্যে ত' পড়ে থাকতে পারবো? তাতে মান বাঁচবে—কেউ দেখতেও আসছে না।

এমন সময় টুন্নু এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে এলো। হেসে বললে, ভাই-বোনে দেখা হলে আর রক্ষে নেই। বক্তৃতা চলছে ত? এবার—আপনি কবে পালাচ্ছেন বলুন ত অমল মামা?

আমি কোথাও যাব না টুন্নু।

যাবেন না, তাহ'লে আমাদের এখানে মাঝে মাঝে আসবেন ত?

অমল হেসে বললে, জাপানীরা যদি না আসে তবে এক আধবার আসবো বৈকি।

ছোড়দিদি আর টুন্নু দুজনেই হেসে উঠলো। মা'য়ের পাশে ব'সে বললে, অমল মামা, এবার কিন্তু একটা মজা দেখলুম। সবাই পালাচ্ছে বটে—মেয়েরা কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। তারা সবাই হেসে আর

আমোদে কুটিকুটি। পুরুষমানুষরাই ভয় পেয়ে দৌড় দিচ্ছে, আর মেয়েদের ঘাড়ে নিয়ে ছুটছে, তাই না?

অমল হাসিমুখে টুনুর দিকে তাকাল। টুনু পুনরায় বললে, মেয়েরা বেশ মজা পেয়ে গেছে এবার। এই দেখুন না, ওবাড়ীর লোকেরা তিরিশ টাকা দিয়ে এক একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করে আনলো— এখান থেকে হাওড়া ইষ্টিশান। মেজগিন্নী সঙ্গে নিল টিয়াপাখী, মেনি-বেড়াল, এক প্যাকেট তাস, একটা লুডুর সেট…তারপর কত যে শাড়ী আর জামা—

অমল বললে, তোমার ভয় করেনা, টুনু?

আমার? একটুও না। ভয় করলেই ভয় বাড়ে।

যদি জাপানীরা বোমা ফেলে, কিংবা আক্রমণ করে?

করুক।

তখন কি করবে তুমি?

টুনু বললে, ইংরেজরা কি করবে তাই আগে শুনি?

ছোড়দিদি ও অমল দু'জনেই খুব হেসে উঠলো।

অমল এই অবসরে চারিদিকে একবার তাকালো। এককালে অবস্থা এদের বেশ ভালোই ছিল কিন্তু ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, জীবনযাত্রাটা এখন দুরূহ হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য আর অনটন এবাড়ীর সর্বত্র সুস্পষ্ট। উপার্জনের কেউ নেই অদূর-ভবিষ্যতে যে সুদীর্ঘ দুঃসময় আসছে—সে অবস্থাটাকে প্রতিরোধ ক'রে শক্ত হয়ে হাল ধরার মতো মানুষও নেই। এই দু'টি নারীর দিন কেমন ক'রে কাটবে বলা কঠিন।

কি কথা ব'লে অমল তখনকার মতো বিদায় নেবে ভাবছে এমন সময় খিড়কি দরজা পেরিয়ে এক বৃদ্ধা ন্যুব্জদেহে কাঁপতে কাঁপতে এই-

দিকে এলেন। তাঁকে দেখে ছোড়দিদি একটু ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, তুমি একটু বসো ভাই, ঠাকুরঘরের পূজোটা সেরে আসি। টুনু, মামার কাছে একটু বোস মা।

বৃদ্ধা এসে বললেন, এ ছেলেটি কে, ভাই?

টুনু বললে, আমার মেজমামার বন্ধু,—অমলমামা!

ও, তা বেশ। একটু কিছু খেতে দেনা দিদি! ওই যে সেই মুগের নাড়ু আছে ঘরে···ওই যে সেদিন দিয়ে গেল ওবাড়ীর ন'বৌ—

আচ্ছা দেবো, তুমি কাপড় ছাড়োগে, রাঙাদিদি—

বুড়ি ধীরে ধীরে চলে গেল। এই প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার কোন অন্ধ গহ্বরের দিকে গিয়ে বুড়ি ঢুকলো,—আর তাঁর সন্ধান পাওয়া গেলনা।

টুনু বললে, অমলমামা, আপনাকে কিন্তু কিছুই খেতে দিতে পারবোনা।

টুনুর সলজ্জ নতমুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিপন্নভাবে অমল বললে, খাবার কথা ভাবছো কেন? এইত চা খেলুম, আবার কি! এবার আমি উঠবো, টুনু—

কিয়ৎক্ষণ পরে ছোড়দিদি শান্ত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন। অমল বললে, তাহ'লে আমি নৃপেনকে কি লিখবো, ছোড়দি?

ছোড়দিদি বললেন, তুমি লিখে দিয়ো আমরা বেশ ভালো আছি!

আপনারা তাহ'লে কোথাও যাচ্ছেন না?

হাসিমুখে ছোড়দিদি বললেন, ভগবান কি করবেন তা ত' আর জানিনে ভাই। তাঁর মনে কি আছে তাও বুঝিনে তবে আপাততঃ এখান থেকে কোথাও যাবার উপায় আমাদের নেই।

অমল বললে, অবিশ্যি প্রাণভয়ে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে এক জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো।

ছোড়দিদি হেসে বললেন, পালাবার মতন টাকাও আমাদের নেই। তা' ছাড়া অত বড় মেয়ে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাবো ভাই? দিনকাল একেই ত' ভালো নয়,—চারদিকে মিলিটারি। কিছু একটা ঘটলে শ্বশুরবাড়ী, বাপের বাড়ী—সকলেরই বদনাম। তুমি নৃপেনকে লিখে দিয়ো অমল, আমরা কোথায়ও যাবো না।

আচ্ছা, আমি তবে এখন উঠি ছোড়দি—এই ব'লে অমল উঠে দাঁড়ালো। হেসে পুনরায় বললে, টুনু, জাপানীরা যদি আসে তাহ'লে কান ম'লেই তাড়িয়ো, কেমন?

টুনু বললে, হ্যাঁ অমলমামা, ভাঙ্গা বন্দুকের বদলে ভাঙ্গা বঁটিখানা রইলো ঘরে। ওরা তা'তেই ভয়ে পালাবে।

অমল হাসিমুখে বেরিয়ে সদর দরজা অবধি গেল, তারপর সহসা কি মনে ক'রে ফিরে এলো। বললে, ছোড়দি, আসল কথাটাই ভুলে গেছি।

কি ভাই?

নাগপুর থেকে নৃপেন পঁচিশটে টাকা পাঠিয়েছে আপনাকে দেবার জন্যে—এই নিন। এই ব'লে অমল পকেট থেকে টাকা বা'র করলো।

ছোড়দিদি বললেন, আমার এখানে না পাঠিয়ে তোমার কাছে পাঠালো কেন? সত্যি নৃপেন পাঠিয়েছে ত?

নিজের মুখের ভাব যথাসাধ্য গোপন ক'রে অমল হেসে উঠলো। বললে, সে কি আর জানে আপনি এখানে এখনো আছেন? হয়ত পালিয়ে গেছেন কোথাও, সে মনে করেছে!

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে ছোড়দি কি যেন ভাবলেন পরে বললেন, হ্যাঁ, এটা বিশ্বাসযোগ্য! আচ্ছা,—খুব উপকার করলে তুমি, ভাই।

টাকা দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অমল সেদিনকার মতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চ'লে গেল। পাছে হঠাৎ পিছন থেকে ডেকে ছোড়দিদি কি মনে ক'রে পঁচিশটে টাকা ফেরৎ দেন—এজন্য অমল হন্ হন্ ক'রে গলির বাঁকে এক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেব্রুয়ারী মাস থেকে দেশের ইতিহাসটা বদলাতে লাগলো! মাঝখানে কিছুদিনের জন্য বিদেশ থেকে ঘুরে এসে অমল দেখলো, কলকাতা থেকে বেশীর ভাগ লোক একেবারেই পালিয়েছে। পথে সন্ধ্যার আলো জ্বলে না, রাত্রের দিকে রাজপথের মাঝখান দিয়ে চলতে গেলে গা ছম ছম করে। দিনের বেলা উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার যতদূর দেখা যায়—পথ ঘাট জনবিরল। হাজার হাজার বাড়ীঘর শূন্য, দোকানপাট নিশ্চিহ্ন। দিবালোকে তখন দেশীয় লোকেরা পালায়, আর রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ইউরোপীয়রা পালায় স্পেশাল্ ট্রেণযোগে। মৃত্যুভয়ভীত, আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত জনসাধারণ।

অমল আর ছোড়দিদিদের ওখানে গেল না। বোমা যখন পড়েনি, এবং জাপানীরাও ঢাল-তলোয়ার নিয়ে এসে পৌছয়নি তখন যেমন ক'রেই হোক তাদের দিন কেটে যাচ্ছে বৈকি। অনেক দিন পরে নৃপেনের কাছ থেকে অমল একখানা চিঠি পেলো, নৃপেন নাগপুর থেকে বিশেষ মিলিটারী কাজে বম্বাই চ'লে গেছে। যুদ্ধ থামার আগে হয়ত সে আর কলকাতায় ফিরতে পারবে না।

তখন বর্ষাকাল, ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব চলছে। দেশের সর্বত্র হত্যাকাণ্ড, অরাজকতা ও সম্পত্তিনাশ ঘটছে। অমল ভাবলো, ছোড়দিদিরা মেয়েছেলে, সুতরাং দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তা'র

নিজের বাড়ীতে প্রায় সকলেই ফিরে এসেছে। জাপানীরা বর্মা দখল ক'রে বিশ্রাম নিচ্ছে, এক আধবার বোমা ফেলে যাচ্ছে ভারতের এখানে ওখানে,—এর বেশী কিছু না। কলকাতা এখনও নিরাপদ,—সুতরাং ছোড়দিদির খবর নেবার আছেই বা কি।

শীতকাল দেখা দিল, রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারালো অবস্থা অনেকটা যেন নিস্তেজ হয়ে এলো। ইতিমধ্যে ভারতের সামরিক শক্তি অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং জনসাধারণ অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করেছে। তবে জাপান-বেতারে অবিশ্রান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে, তা'রা শীঘ্রই প্রবল শক্তিতে ভারত অক্রমণ করবে। এদেশে তখন প্রচুর পরিমাণে ইংরাজ বিদ্বেষ জমে উঠেছে। অমল ভাবছিল, কি হয়, কি হয়!

এমন সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে কলকাতায় জাপানী বোমাবর্ষণ সুরু হয়। এতদিন পরে যেন পালে বাঘ পড়লো। বিপদ যতদিন আসন্ন ছিল ততদিনই আতঙ্ক, যেদিন সেই বিপদ সত্য সত্যই এলো, সেদিন অমল মনে মনে বললে, ও এই তুমি? এর বেশী কিছু নয়?

আবার সেই লক্ষ লক্ষ লোকের পলায়ন। উন্মত্ত, মূঢ় অন্ধ ও দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য জনসাধারণ ছুটেছে···ছুটেছে···যেদিকে দু'চোখ যায়। রোগে অপঘাতে, দুর্ঘটনায় যত পলায়মান নরনারীর মৃত্যু ঘটলো,—বোমাবর্ষণে তার' শতাংশের এক অংশও মারা যায়নি। কলকাতাটা সাতদিনের মধ্যে শ্মশান হয়ে গেল। অমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সব।

বেলেঘাটার ওদিকে বোমা পড়েনি, তবুও অমল ছোড়দিদির একটা খবর নেবে ভাবছিল, এমন সময় বোম্বাই থেকে নৃপেনের তার এলো, তোমরা আর ছোড়দিদিরা কেমন আছ শীঘ্র জানাও।

অমল তাড়াতাড়ি চ'লে গেল বেলেঘাটার ওদিকে।

তখন মধ্যাহ্ন, সুতরাং পথঘাট চেনার কোন অসুবিধা নেই, এবং তা'র পরিচিত পথ—ভুলে যাবার কথাও নয়। কিন্তু অনেকক্ষণ একই গলির মধ্যে ঘোরাফেরা ক'রে নম্বর মিলিয়ে অমল একই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সন্দেহ নাই, এইটিই ছোড়দিদিদের বাড়ী, সেই সুবিস্তৃত পুরনো পাঁচিল, দোতলার ভাঙা অংশটা তেমনই রয়েছে, পুরনো দরজাটাও সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে—তবু সমস্ত বাড়ীটার চেহারা ফিরে গেছে! বাড়ীর ধারে আগে এই টিউব-ওয়েলটি ছিল না, আজকাল এটা নতুন হয়েছে। সেই বাড়ী কিন্তু সেই আগেকার বাড়ী নয়। ভিতরে কা'দের যেন একটা কলরব চলছে,—একটা মস্ত সমারোহ।

হয়ত কোথাও কেউ অমলের সন্দেহজনক গতিভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে থাকবে,—তাকে নির্বোধের মতন অমনি দাঁড়ায়ে থাকতে দেখে সহসা একটি খাকি পোষাকপরা লোক এগিয়ে এসে বললে, এই—ক্যা দেখতা?

অকস্মাৎ অমল হকচকিয়ে গেল। বললে, আমার লোক এখানে থাকতো।

ক্যা? তুমারা আদমি?—লোকটা কাছে এগিয়ে এলো।

অমল বললে, হ্যাঁ, এ কোঠি হামারি বহিনকা!

হিয়া কোই নেই,—এ মিলিটারী ব্যারাক হ্যায়···যাও।

অমল মূঢ়ের মতো কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেল। সেইদিনই সে বোম্বাইতে টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে জানালো, ছোড়দিদিরা কোথায় চ'লে গেছে, তা সে জানে না। তাদের বাড়ীঘর মিলিটারীর লোকেরা দখল করেছে।

কয়েকদিন অবধি অমল অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক জায়গায়

খবর নিয়েছে, কিন্তু ছোড়দিদির কোন সন্ধান না পেয়ে মাস তিনেক পরে একদিন সত্যই সে হাল ছেড়ে দিল। ছোড়দিদি হলেন.তা'র বন্ধুর দিদি, এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূ। তাঁর সম্বন্ধে অতিশয় উদ্বেগ এবং কৌতূহল খানিকটা বেমানান বৈ কি। অমল সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিজের কাজে মন দিল।

দেশের দিকে যতদূর দেখা যায়, সমস্তটাই আতঙ্ক পাণ্ডুর, নৈরাশ্যময় এবং—জনজীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। অথচ ভিতরে ভিতরে কী বিপুল পরিবর্তন—কোথাও স্থিতিশীলতা নেই। অমলের বন্ধুরা কে কোথায় হারিয়ে গেল—ভাগ্যচক্রে তারা সবাই ঘূর্ণ্যমান। যারা নীচে ছিল তারা উপরে উঠে এলো, যারা উপরের মানুষ, তারা গেল তলিয়ে। অমল চেয়ে দেখলো, তা'র পারিপার্শ্বিক জীবনে যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনাকে আঁকড়ে ছিল, তাদের অন্তরলোকে কী বিরাট বিপ্লব! স্বেচ্ছাতন্ত্রী, অধীর, অস্থায়ী, ক্ষণমর্জী নরনারীর দল। নগরের পরিধির মধ্যে সবাই রয়েছে একত্র, কিন্তু কী বিচ্ছিন্ন, কী আত্মকেন্দ্রিক। মরুভূমিতে কত অপরিমেয় বালুকণা একত্র, কিন্তু কণায় কণায় কোনো যোগ নেই। প্রকাণ্ড চাকা, নিত্যপরিবর্তনের দুরন্ত গতিতে ঘুরছে—মানুষ ছিটকে পড়ছে তা'র থেকে। অমল এদের থেকে পৃথক,—অমলের সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই। অমল একা।

বহুদিন পরে ধর্মতলার মোড়ে ছোড়দিদির সেজ ভাসুরের সঙ্গে অমলের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি চিনতে পারেন নি অমলকে। অমল তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, কেমন আছেন প্রকাশবাবু? আমি অমল, নৃপেনের বন্ধু।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু কী বৃদ্ধ, মৃত্যু

যেন ঘনিয়ে রয়েছে মুখে চোখে। তিনি হতচকিত হয়ে কিয়ৎক্ষণ পথের দিকে তাকালেন তারপর বললেন, কেমন আছি? ঠিক বলা কঠিন ভাই।

অমল বললে, টুমুরা কোথায় জানেন?

টুমু? প্রকাশবাবু যেন অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন, অতঃপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, ওঃ টুমু, মানে ছোট বৌমার মেয়ে…হ্যাঁ, মেয়েটি ভারি লক্ষ্মী ছিল!

কোথায় তা'রা?

ঘাড় নেড়ে প্রকাশ বাবু বললেন, তাত' বলতে পারিনে, ভাই! মাস ছয়েক আগে কে যেন বললে, তা'রা যেন কোথায়—!

উৎসুক অমল প্রশ্ন করলো, কোথায়? কলকাতায় নেই? দেশে?

প্রকাশবাবু একটা ল্যাম্প-পোষ্টে হেলান দিয়ে কেমন একটা ক্লান্তির সঙ্গে আত্মবিস্মৃত-নির্লিপ্ত হাসি হাসলেন। বললেন দেশে! কিছু নেই গ্রামে। একখানা করকেটের ঘর ছিল দাঁড়িয়ে, বানের সময় তাও ভেসে গেছে। সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই।

অমল বললে, নৃপেন আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখছে ছোড়দিদিদের খবর জানবার জন্যে। অথচ আমি এক বছর হয়ে গেল ওদের খবর জানিনে। কি করি বলুন ত?

প্রকাশবাবু হঠাৎ এবার সজাগ হয়ে বললেন, এবার আমি যাই অমল। নৃপেনকে লিখে দিয়ো, চারিদিকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে—এ আগুন না নিবলে জানা যাবে না, কে বেঁচে আছে, আর কে নাই।

প্রকাশবাবু মন্থরগতিতে হাঁটতে লাগলেন ধর্মতলার পথ দিয়ে।

অমল পিছন দিক থেকে চেয়ে রইলো। তিনি যেন সেই সম্ভ্রান্ত রায় পরিবারের ভগ্নাবশেষ! অমলের চাপা চাপা নিশ্বাস পড়লো।

বোমাবর্ষণের আতঙ্কে লক্ষ লক্ষ লোক পালিয়েছিল, কিন্তু বোমা-বর্ষণের পর থেকে লোক বাড়তে লাগলো নগরে! অসংখ্য অগণ্য কাজ জুটছে এখানে। কোটি কোটি কাগজের টুকরো ছাপা হচ্ছে,—তা'র নাম টাকা। বসন্তের ঝরাপাতার মতো রাশি রাশি কাগজ যুদ্ধের ঝড়ের তাড়নায় চারিদিকে উড়ছে। সহস্র সহস্র যন্ত্রশালা সর্বত্র দাঁড়িয়ে উঠলো, তার সঙ্গে অগণ্য যুদ্ধের দপ্তর। অমল দেখলো মৃত্যুর ভয় স'রে গেছে, তা'র জায়গা নিয়েছে লোভের লেলিহান জিহ্বা। সঙ্গে সঙ্গে এলো চোরাবাজার এবং খাদ্যসম্ভার নিয়ে জুয়াখেলা। আবার অভিনব যুগের আরম্ভ।

ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালো। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল করাল চেহারায়। দুর্দিনের সেই বীভৎস বিকারের মাঝখানে অমল একবার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো, যদি ছোড়দিদিদের কোনো খোঁজ পায়। বার বার সে বেলেঘাটার ওদিকে ছুটে গেল, অনেক বাড়ীর কড়া নাড়লো, অনেক প্রশ্ন করলো অনেক প্রতিবেশীকে,—কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মকাল ধূ ধূ করছে। দেশে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের তখনও কিছু চক্ষু লজ্জা ছিল, তাই পথের শবদেহগুলি ভোরের আগেই তা'রা সরিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে শ্মশানে জায়গা হয় না, শবদেহ পথে প'ড়ে থাকে। গাদিতে নিয়ে যাবার লোক নেই, গাড়ী নেই, পেট্রল নেই। অমল একদিন শ্মশানে গিয়ে দেখে এলো, শবদাহের কাঠ পাওয়া যায় না। ক্রমে বর্ষা নামলো; কলকাতার পথে ঘাটে প্রতিদিন শত শত মৃতদেহ প'চে ওঠে। অমল একটা

ভয়ানক আতঙ্কে পথে-পথে কাঁকে যেন খুঁজে বেড়ায়। অল্প-বয়সী মুমূর্ষু বিধবা দেখলেই অমল হেঁট হয়ে লক্ষ্য করে সে তা'র পরিচিত কিনা। সে নিশ্চয় জানে, ছোড়দিদির কোনো সহায় সম্বল নেই, শ্বশুরবাড়ী থেকে কোনো সাহায্য সে পাবে না, কেউ তাকে দয়া করবে না,—তাকে মুখ বুজে উপবাস করতে হবে। অমল অক্লান্তভাবে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

একদনি হতাশ হয়ে সে চেষ্টা ছেড়ে দিল। নৃপেনকে সবিস্তারে চিঠি লিখে জানালো, ছোড়দিকে কোথাও সে খুঁজে পায়নি। তা'র সাধ্যের অতীত।

এমনি ক'রে প্রায় দেড় বছর কেটে গেলো।

ইউরোপের যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থা দেখা দিয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে, জার্মাণীর আর বোধ হয় রক্ষা নেই। তবে হিটলার হয়ত তা'র পাশুপত অস্ত্র এখনও লুকিয়ে রেখেছে; চরম অবস্থায় নিক্ষেপ করতে পারে। ওদিকে জাপানকে আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র চলছে। ভারতের প্রান্ত থেকে জাপানীদের তাড়ানো হয়েছে।

এমনি সময়টায় একদিন লোয়ার সার্কুলার রোডের এক বিদেশী পল্লীর ধারে চলতে চলতে সহসা অমল থমকে দাঁড়ালো। অদূরে ফুটপাথের ধারে একখানা দামী মোটর থেকে জনৈক শিখ মিলিটারী অফিসার নামলেন, তাঁ'র সঙ্গে একজন মহিলা। তিন বছর আগে শেষবার অমল ছোড়দিদিকে দেখেছিল,—এ মহিলার সঙ্গে সেই ছোড়দির সামঞ্জস্য বড়ই কম। অমল ভুল করেছে, শীতের সন্ধ্যার কুয়াশায় সে ঠিক চিনতে পারেনি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ যুবকের মতো তারও চোখের জ্যোতি ক'মে গেছে,—উনি সেই ছোড়দি নন্। এ হোলো প্রেতিনী, একে মানুষ বলা চলবে না।

অমল তাড়াতাড়ি নতমুখে চ'লে গেল। সেই পথের মোড়ে একটি পানের দোকানের কাছে এসে সে দাঁড়ালো। অলক্ষ্যে ঘষা কাঁচের আয়নার ভিতরে সে নিজের চেহারার দিকে তাকালো। মনে মনে বললে, ওরে মূঢ়, প্রাচীন নীতিবুদ্ধির পুতুল চিনতে পারলি নে? না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোলো না? কোনটা?

অমল ফিরে দাঁড়ালো। পুরনো বিশ্বাস একযুগে ভেঙে নতুন বিশ্বাস দাঁড়িয়ে ওঠে। এ যুদ্ধে ভেঙে গেল সব,—অভ্যাস, আদর্শ, নীতি চিন্তাধারা। এ যুদ্ধ একটি প্রকাণ্ড নাটক,—এক এক অঙ্কে এক এক যুগ সৃষ্টি হয়েছে, তা জানিস? মূঢ়, তুই কি সেই তিন বছর আগেকার ছোড়দিকেই ধরে থাকতে চাস? মূর্খ, নিজের অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে বর্তমানের গতিশীলতার সঙ্গে বদলে দিতে পারিসনে? একথা কি মনে থাকে না, অবস্থার পরিবর্তনশীলতাকে মেয়েরাই সহজে প্রথমে স্বীকার ক'রে নেয়? ছোড়দিও ত' সেই মেয়েদেরই একজন রে।

অমল আবার ফিরে এলো। পা দু'খানা ঠিক পড়ছে না, কেমন যেন সভয় জড়তায় আর সঙ্কোচে, অথচ অধীর উত্তেজনায় অগ্রপশ্চাৎ বোধহীন। কয়েক পা এসে দেখলো মোটরখানা তখনও দাঁড়িয়ে, কিন্তু আরোহীরা ভিতরে গেছে।

অমল গিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করতেই গার্ড বাধা দিল। বাড়ীটা যতদূর মনে হচ্ছে সামরিক কর্মচারীদের বাসস্থান। অমল বললে মায়িজী ভিতর গিয়া, উনকো মাংতা—

তুম্ কোন্ হায়?

উন্‌কো ভাই—

গার্ড একটি স্লিপ ও পেন্‌সিল দিল। অমল লিখে পাঠালো।

কি যেন লিখলো কি যেন ভাষায়—অস্থির হাতে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে। তারপর সে দাঁড়িয়ে রইলো।

দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। কেমন একটা অপমানজনক হীনতাবোধ ঘুলিয়ে উঠছে তার শরীরে—যার কোন ব্যাখ্যা নেই। গলার ভিতর থেকে কিছু একটা উঠে আসছে,—সেটা যেন কুণ্ডলীকৃত মৃত্যু—উঠে আসছে হৃদপিণ্ডের কোনো একটা জায়গা থেকে। অমল অনেকক্ষণ দাঁড়ালো।

এমন সময় মিলিটারী গার্ড এসে জানালো, যাইয়ে উপরমে—

সামনেই কার্পেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি। এদিকে ওদিকে অজস্র আসবাব, আর সাজসজ্জা। সিঁড়ির দেওয়ালে দামী দামী বিলাতি ছবি ঝোলানো। অমল উঠে গিয়ে ড্রয়িং হলে এসে দাঁড়ালো।

সেই মহিলাটি এবার বেরিয়ে এলেন সেই স্লিপটি হাতে নিয়ে। অমলকে দেখে বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, ওঃ মি! নামটি দেখে ঠিক—মানে, ঠিক আমার মনে পড়েনি!

ঢাকা দেওয়া আলোটার নীচে এসে মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। সেই আলোয় হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নেবার সময় অমল লক্ষ্য ক'রে দেখলো, তাঁর পায়ে মুসলমানী সবুজ মখমলের স্লিপার এবং পায়ের নখগুলিতে রক্তরঙীন পালিশ।

তিনি বললেন, আমি এখনই বেরুবো খুব তাড়াতাড়ি—একটু বসতে পারো তুমি! —এই ব'লে তিনি হাতঘড়িতে সময় লক্ষ্য ক'রে পুনরায় বললেন, বাই-বাই, তোমাদের সব খবর কি? মা কেমন আছেন?

অমল বললে, আপনি ত' জানেন, আমার মা মারা গেছেন!

ওঃ সরি! তারপর? এদিকে কোথায়?

এবার ফস ক'রে অমল বললে, আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন, ছোড়দি ?

ছোড়দিদি হেসে বললেন, এ যুদ্ধে সবই সম্ভব !

অল্প আলোতেও অমল লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ছোড়দিদির ঠোঁটে ও গালে রং মাখানো, চোখে হাল্কা সুর্মা, ঘন চুলের রাশি থেকে চূর্ণ গুচ্ছ দুলছে ! তাঁর এক হাতে ঘড়ি, অন্য হাতে সোনার সরু বালাটি ঝিকমিক করছে। অলঙ্কারে আর আভরণে তাঁর চেহারাটিতে একটি ধনবতী রাজপুতানীর ভাব এসেছে। শুধু চোখের কোণে দেখা যায় অগ্নিকোণ। যেন মাঝে মাঝে বিপ্লবের বিদ্যুদ্দাম ঝিকমিক করে উঠছে।

অমল নিজের মনের অবস্থা কতকটা সামলে নিয়ে বললে, সেই দেখা আপনার সঙ্গে...তারপর এই তিন বছর পেরিয়ে গেল···বোমা পড়া, দুর্ভিক্ষ, ভারত আক্রমণ, মহামারী···কত যে বদলে গেছে সব, ছোড়দি—

ছোড়দিদি চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, মাথায় ঘোমটা তাঁর নেই, এলো খোঁপায় গাঁথা রয়েছে গোটা দুই আইভরির কাঁটা, দুই কানে তাঁর উজ্জ্বল দু'টি পাথর। দু'পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে নিজের পিছন দিকটা একবার লক্ষ্য করে অন্যমনস্কভাবে অমলের কথা শুনছিলেন।

অমল বলতে লাগলো, কত যে খুঁজেছি আপনাকে···পথে ঘাটে, সেই বেলেঘাটার বাড়ীতে, আপনার ভাসুরদের ওখানে—

উৎসাহ সহকারে আরো কিছু হয়ত অমল বলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঘরের ভিতর কতকগুলি লোকের কোলাহলের মাঝখান থেকে হঠাৎ পরুষ কণ্ঠের ডাক এলো, মিসেস রয়—?

থাক—বলে ছোড়দিদি অমলকে বাধা দিয়ে থামালেন। তারপর পর্দার ফাঁকে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে সহাস্যে নিজের অধর দংশন করে বললেন, ইয়া…just coming…little formalities

তারপর মুখ ফিরিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, হ্যাঁ…কি যেন নামটা তোমার…ভুলে যাই! হ্যাঁ আর একদিন তুমি আসতে পারো,—আর অবিশ্যি এইত দেখা হয়ে গেল। তা'ছাড়া সাহেবরা থাকে এখানে,—ওসব পুরনো আলোচনা এখানে না করাই ভালো—

এমন সময়ে সেই শিখ অফিসারটি বেরিয়ে এলেন। বললেন, ইয়েস? উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ছোড়দিদি সেই ভদ্রলোকের হাতখানা ধরলেন বললেন, ইনিই মেজর সিং…my great friend indeed। হ্যাঁ, তুমি বোধ হয় একটা চাকরি চাইতে এসেছিলে, না?

অমল কি যেন বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে তার গলায় আটকে গেল। ছোড়দিদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললেন, হ্যাঁ, মানে—কিছু বলতে হবেনা, বুঝে নিয়েছি—তুমি খুব needy! কতকগুলো চাকরি আমি করে দিয়েছি কতকগুলো ছেলেমেয়ের… অবিশ্যি দু'টো চারটে এখনও হাতে আছে—

অমল বললে, না, আমি চাকরি চাইনে ছোড়দি!

চাওনা?—ছোড়দিদি বললেন, I see, সেই ভালো,—দু'শো একশো টাকার চাকরি আজকাল লজ্জার কথা,—আচ্ছা, চিয়ারো।

অমল কিছু বলবার আগেই মেজর সিং সহাস্য আতিশয্যে ছোড়দির একখানি নগ্নবাহু জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। পর্দার ওপারে মস্ত টেবলের ভোজনের আসরে তখন মোটা ও মিহি গলার অনেকগুলি হাসি গলগলিয়ে উপচিয়ে পড়ছে।

অমল পাথর নয় যে চলৎশক্তিহীন। সে মানুষ, তাই এক সময়ে

নড়ে উঠে সিঁড়িটা খুঁজে নেমে আসছিল। সহসা নীচের তলায় শোনা গেল কল্লোলোচ্ছ্বসিত হাসির আওয়াজ। অমল ঠাহর করে দেখলো টুনু উপরদিকে উঠে আসছে,—তার সঙ্গে একটি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক। অমল বড় সিঁড়িটার একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ালো।

টুনুর পরণে মিহি জর্জেটের শাড়ী, গায়ে ঝলমলে সার্টিনের জামা,—কিন্তু পিঠের দিকে সেই জামার আব্রুটা নেই,—মাঝখানটা নগ্ন। টুনুর চুলগুলি তাম্রবর্ণে পরিণত, মুখখানা টয়লেট করা,—সমস্ত সিঁড়িটায় রূপের গৌরব ছড়িয়ে সে উঠে আসছিল,—আর সেই তরুণটি ছুটে আসছে তাকে ধরে ফেলবার জন্য। যৌবনের জয়োৎসবে ভরা দু'টি মুখ।

সহসা টুনু দাঁড়ালো। নিয়ন্ত্রিত আলোর আভায় অমলকে দেখে বললে, হ্যাল-লো?

অমল স্মিতমুখে বললে, চিনতে পারছ টুনু?

টুনু বললে, ও ইয়েস··· তুমি অমলাদা—

ছি আমি দাদা নই টুনু, আমি তোমার মামা।

ঘন তীব্র হাসি হেঁসে টুনু বললে, না না, কেউ নয় তুমি···তবু কী মিষ্টি তুমি···sweet eternally!—এই বলে সে তাড়াতাড়ি তার নীরব হাতখানা বাড়িয়ে অমলের একখানা থরথরে হাত টেনে নিয়ে ঝাঁকুনী দিল।

অমল বললে, আর আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই টুনু, তোমাদের দেখে খুশী হয়ে গেলুম।

টুনু বললে, মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সাহেব ছোকরাটি হাসিমুখে বললে, I think she is very busy—eh?

এক রাশি হাসিতে টুমু সিঁড়িটা ভরিয়ে দিল। বললে, মায়ের একটুও সময় নেই আজকাল। Come on John.

সোরগোল তুলে আবার টুমু ও য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণটি দ্রুতগতিতে উপরে উঠে গেল। একটা খসখসে বাসি মিহি সুগন্ধ বাতাসটাকে ভরিয়ে দিল।

ওরা ভালো আছে, সুখে ও আনন্দে আছে,—আর কোনদিন ওদের সংবাদ নিতে হবেনা,—এমনি একটা অদ্ভুত স্বস্তিবোধ নিয়ে অমল সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। অভিমান, ক্ষোভ, চিত্তবিকার—কিছু নেই তার। সে যেন এই ভাঙনকে সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারে, তা'র বুকের কোণ থেকে যেন কোনো প্রকার আর্ত প্রতিবাদ না ওঠে।

কিন্তু পথে নেমে এসে অমল কেমন যেন নিরুপায়ের মতো এলোমেলো হাঁটতে লাগলো। তা'র কোন্ পথ—সে ভুলে গেছে! ওদিকে, না এদিকে? ঘোর অন্ধকার রাত চারিদিকে,—আড়ষ্ট শ্রীহীন, ভয়ভীত, শীতার্ত অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকার থেকে মুক্তি কবে হবে? এর মধ্যে সত্য কোথা? আলো কই?

ত'ার হৃদপিণ্ড থেকে আবার সেই কুণ্ডলীকৃত মৃত্যু যেন উঠে এলো তা'র গলার কাছে—এবার অমল আর সামলাতে পারলো না। কালপ্রহরীর মতো সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোহার একটা টেলিগ্রাফ পোষ্ট। সেইটাকে দুই হাতে ধ'রে তা'র তুহীনশীতল গায়ে মাথা রেখে সহসা অমলের চোখে ঝরঝরিয়ে জল এলো। তারপর একসময়ে সে যেন বর্তমান যুগান্তরের সর্বনাশা বীভৎসতার মাঝখান থেকে মুখ তুলে কম্পিতকণ্ঠে বলতে চাইল, অনেক গেল, আমাদের অনেক গেল এ যুদ্ধে···কত যে ধ্বংস, কত মহতের যে সর্বনাশ···তোমাকে আমরা বোঝাতে পারবোনা।

প্রারম্ভ

মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানতো। মফঃস্বল সহরে সে মানুষ হয়েছে, সুতরাং কতদূর অবধি সে এগিয়েছিল ঠিক জানা যায় না। তবে কেউ বলে ম্যাট্রিক, কেউ বলে ওর কাছাকাছি। বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ী পক্ষ থেকে বললে, ওই যথেষ্ট, চিঠিপত্র হিসেব নিকেশ আর একটু আধটু এদিক ওদিক জানলেই হোলো। তা ছাড়া মেয়েমানুষ—লেখাপড়া না জানলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

অতএব দেখেশুনে পছন্দ ক'রেই লতিকাকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাওয়া হোলো। লতিকাও লাজুক আর নম্র মেয়ে—পাছে তার ওই বিদ্যাবুদ্ধির কথাটা নিয়ে কেউ বিশেষ আলাপ আলোচনা করে, এজন্য সেও আড়ষ্ট হয়ে রইলো। লেখাপড়া জানাটা যেন মস্ত লজ্জা। স্বামী যখন তাকে সমাদর করে জানতে চাইলো, তুমি পাশ করেছিলে লতু?

লতিকা বরের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, তোমার দিব্যি, তুমি আর একদিনও আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করোনা।

প্রতুল সেদিন থেকে হেসে চুপ ক'রে গিয়েছিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রৌঢ়া এবং প্রবীনের দলে একটু আধটু কানাকানি এবং কটাক্ষ বিনিময় আছে—নতুন বৌয়ের চলন-ধরণ নিয়ে একটু সমালোচনাও হয়। কিন্তু এসব কথার টুকরো কানে এলেই লতিকা

কণ্টকিত হয়ে ওঠে। বাস্তবিক কী লজ্জার কথা, সকলের সামনে সে এরপর বেরুবে কেমন ক'রে? ঘরের মধ্যে ব'সে লেখাপড়া শেখার লজ্জায় সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়। তা'র কান্না আসে। বাবা ও মাকে সে অনেকবার শিখিয়ে দিয়েছিল, শ্বশুরবাড়ীতে তা'র লেখাপড়ার কথাটা যেন প্রকাশ না পায় কিন্তু মা-বাবা তা'র কথা না শোনার ফলেই ত' এই সর্ব্বনাশ।

শ্বশুরবাড়ীতে আছেন বিপত্নীক খুড় শ্বশুর, বিধবা শাশুড়ী, বিধবা পিসিশাশুড়ী, নাবালক দেবর, একটি কুমারী ননদ—তা ছাড়া তা'র তিন ভাসুর এবং স্বামী। অর্থাৎ এদিক সেদিক সব মিলিয়ে পরিজনের সংখ্যা অনেকগুলি। খরচপত্র কম নয়, যুদ্ধের বাজারে জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া, চা'ল কাপড় ইত্যাদি দুর্মূল্য—বাড়ীতে রাঁধুনী বামন অথবা চাকর রাখার ক্ষমতা নেই। পুরুষ মানুষেরা সকলেই চাকরি-বাকরি করে এবং এ বাজারের তুলনায় উপার্জ্জন সকলেরই কম। বিশেষ ক'রে প্রতুলের মাসিক বেতন যৎসামান্যই। লতিকা বুদ্ধিমতী মেয়ে, সুতরাং এ অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত খরচপত্র কমিয়ে সংসারের মাসিক খরচটার ওপরেই বেশি সাহায্য করবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, এটা একান্নবর্ত্তী পরিবার। লতিকা কাপড় পরে কম, সাবান মাখে না, কাপড়কাচা সাবানে জামা কেচে নেয়, পান ও দুধ খায় না, সকাল বেলাকার জলযোগ বাদ দিয়েছে—সর্ব্বপ্রকার নিঃশব্দ স্বার্থত্যাগের দ্বারা সংসারটিকে সে স্বাবলম্বী ও সুশ্রী ক'রে রাখার চেষ্টা করতে থাকে।

একদিন প্রতুল বললে, এবার পূজোয় তোমাকে শান্তিপুরী শাড়ী কিনে দেবো।

লতিকা চোখ কপালে তুলে বললে, অমন কথা বলো না তুমি।

মুন্নু কত বড় হয়েছে দেখেছ ? আগে বোনের বিয়ে দাও দেখি কেমন তুমি বাহাদুর ?

প্রতুল চোখ পাকিয়ে বললে, কেন মুন্নু কি আমার একার বোন যে একা আমি ওর বিয়ে দেবো ? চারভাগের এক ভাগ—এর বেশি আমি কিছুতেই দিতে পারবো না।

লতিকা বললে, অমন কথা মুখে আনতে নেই ! ভাগাভাগির কথা তুললেই ঘর ভাঙে তা জানো ? তুমি যদি অমন করো তাহলে আমি সব গয়না ঠাকুরঝির বিয়েতে দিয়ে দেবো ব'লে রাখলুম।

চোখ পাকিয়ে লতিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্ত্রীর উদার বিবেচনার আন্তরিক চেহারাটা উপলব্ধি করে প্রতুলের বুকখানা আনন্দে ও গর্ব্বে ভ'রে উঠলো।

ওদিকে যুদ্ধের চেহারাটা ভালো নয়। দিন দিনই অবস্থা মন্দের দিকে নেমে আসছে। সর্ব্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার নাকি চালান যাচ্ছে বিদেশে জাহাজযোগে। ইংরেজের অবস্থা খুব খারাপ, এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এ-আর-পি'র লোকেরা রাস্তা দিয়ে যায়, লতিকার ভয় করে। সন্ধ্যা থেকে কলকাতার পথ ঘাট অন্ধকার সকাল সকাল সবাই মিলে বাড়ি না ফিরলে লতিকার কল্পনাটা যেন আতঙ্কময় হয়ে ওঠে। ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে মিলিটারী লরীর আনাগোনার আওয়াজ শুনলে বুকের মধ্যে যেন গুরু গুরু করে। এরোপ্লেনেরা অহোরাত্র কলকাতার আকাশ পাহারা দেয়। যুদ্ধের অবস্থা খুবই খারাপ কোথাও আশ্বাস নেই।

প্রতুলদের বাড়ীতে চোদ্দ পনেরো জন লোক, তাছাড়া একজন ঠিকে ঝিও আছে। সকলের সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করতে গেলে অনেকখানি ব্যয় সঙ্কোচ করা দরকার। খুড়শ্বশুর মহাশয়ের উপার্জ্জন

যৎকিঞ্চিৎ, তিনি যা আনেন, তাতে নিজের খরচটা কোনমতে চালান, এবং বাড়ী ভাড়া বাবদ পাঁচটি ক'রে টাকা দেন। বাড়ীভাড়া ষাট টাকা, এবং বাড়ীওয়ালা সম্প্রতি জানিয়েছেন, বাড়ীর ভাড়া না বাড়ালে আর চলছে না। কিন্তু এ বাড়ীতে সকলের উপার্জ্জন একত্র মিলিয়ে দেখা যায়, সবশুদ্ধ কোন মতে শ'তিনেক টাকায় এসে দাঁড়ায়।

লতিকা একদিন গোপনে কাগজ কলম নিয়ে সংসারের হিসেব করতে বসলো। চালের দাম উঠেছে পাঁচ টাকা থেকে পনেরো টাকায়, কাপড় তিন টাকা থেকে বারো টাকায়। একজোড়া জুতোর দাম পনেরো টাকা। এ ছাড়া ধোপা, গয়লা, কয়লা এদের অনেক দর বেড়ে গেছে। বাড়ীর ভাড়া সামনের মাস থেকে পঁচাত্তরে দাঁড়াবে। শাশুড়ীরা বিধবা, তাঁদের রান্না-বান্না আলাদা—বাড়ীতে পালপার্ব্বণ, লোক-লৌকিকতা, এটা-ওটা-সেটা। হিসেব করতে করতে লতিকার গায়ে যেন জ্বর এলো। এ বাড়ীতে কেউ কিছুই ভাবছে না, কেমন ভাবে কি প্রকারে সংসার চলে যাচ্ছে, এসব কেউ তলিয়ে দেখে না। কিন্তু ঘরের কোণে ব'সে লতিকা এই সংসারের পরিণাম চিন্তা ক'রে যেন আঁৎকে উঠলো। কোথাও যেন কুলকিনারা নাই।

লতিকা যা কল্পনা করেছিল, ঠিক তাই। মাসকাবারে একদিন টাকাকড়ির হিসাব মেলাবার সময় পুরুষ মহলের কথাবার্ত্তায় জানা গেল, সংসার খরচ বাবদ প্রায় পাঁচশো টাকা দেনা হয়ে গেছে। এই দেনা কে এবং কবে শোধ করবে, তা অনিশ্চিত। যুদ্ধের দরুণ সকলের মাইনের উপর কিছু কিছু ভাতা পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু খরচ যেখানে বেড়েছে চোদ্দ আনা, দুর্ম্মূল্য ভাতা সেখানে বেড়েছে মাত্র দুই আনা।

বড়-জা অমলার একটি ছোট ভাই এখানে আনাগোনা করে, তার নাম নীরেন। সে একটি প্রস্তাব করলো, কোন্ যন্ত্রপাতির কারখানায়

একটি ঠিকাদারের কাজ খালি আছে, সে ছোট দেবরটির জন্য করে দিতে পারে। মাইনে চল্লিশ টাকা। তবে সকাল আটটা থেকে বিকাল ছ'টা—মাঝখানে এক ঘণ্টা খাবার ছুটি।

বেণু সেই চাকরিটা নিল। ম্যাট্রিক পাশ ছেলে, আগে পনেরো টাকাও জুটতো কি না সন্দেহ,—এখন চল্লিশ টাকা। দেশের অবস্থা ভালই বলতে হবে। এ যুদ্ধে অনেক সুবিধাও হ'য়েছে অনেকের।

চল্লিশ টাকার মধ্যে জলখাবার আর আনাগোনার খরচে দশ টাকা বাদ দাও, সংসারে তিরিশটে টাকা এলো। নীরেন বললে, আর যদি কেউ থাকতো, তারও কাজ জুটে যেতো। আজকাল কাজ কাঁদে লোকের জন্য। যুদ্ধের বাজারে চাকরীর কোন অভাব নেই; যার যেটুকু ক্ষমতা আর বিদ্যে সে সেইরূপই কাজ করিতে পারে। মেয়েরা কত কাজ করছে আজকাল, দেখলে অবাক হতে হয়। নার্সিংয়ে, ক্যান্টিনে, সাপ্লাইতে, শিল্প বিভাগে, টেলিফোনে, ব্যাঙ্কে—কত অসংখ্য মেয়ে। এই ত আমাদের সাপ্লাইতে প্রায় চার শো মেয়ে,—সবাই কি উচ্চ শিক্ষিত? মনেও করবেন না! দিন না আপনার ছোট বোন মুন্নুকে, এখনি চাকরী হয়ে যাবে।

প্রফুল্লবাবু তাঁর শ্যালককে বললেন, মুন্নু ফার্ষ্ট-বুক অবধি পড়েছে।

নীরেন বললে, ওতেই হবে, বলবে—নন্‌-ম্যাট্রিক।

কিন্তু ওর বয়স যে মাত্র পনেরো!

তা'তে আর কি! আটারো ব'লে চালালেই চলবে! অবিশ্যি দুটো চারটে ইংরেজি কথা বলা দরকার।

প্রফুল্লবাবু তাঁর ছোট বোন মুন্নুকে ডেকে বললেন, কিরে পাগলি, চাকরি করতে পারবি?

মুন্নু বললে, চাকরি!

হ্যাঁরে চাকরি……এই এত টাকা মাইনে পাবি! রাজী?

মুন্নু বললে, তোমাদের গলায় দড়ি জোটে না?

ঘরশুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। মুন্নু কাঁদো কাঁদো মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রফুল্লবাবু বললেন, আমাদের কোলের বোন……মাথার মণি। ও আমাদের রোজগার ক'রে খাওয়াবে, সেই দিনের জন্যে নাই বেঁচে রইলুম, নীরেন?

নীরেন বললে, ওইতেই আপনারা মরেছেন! ওসব পুরণো নীতিবুদ্ধি এ যুগে চলে না। আপনাদের খরচ বেড়েছে অথচ রোজগার বাড়েনি—এত' মরবার পন্থা। এরপর আরও খারাপ অবস্থা দাঁড়াবে, তখন কি করবেন? চালের দাম পাঁচগুণ বাড়বে, কাপড়-চোপড় পাওয়া যাবে না, মাছমাংস হবে আগুন-দর—দুধ-ঘি-তেল সব ভেজাল, —খুব খারাপ দিন আসছে আমি ব'লে দিচ্ছি।

লতিকা আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে চুপ ক'রে চ'লে গেল।

দিনে দিনে দেখা যাচ্ছে নীরেনের কথাগুলো মিথ্যে নয়। ইতি-মধ্যে দুধের দাম চড়লো, চিনি পাওয়া যাচ্ছে না—এবং কয়লা কিনতে হয় গোপনে চোরা বাজার থেকে। গয়লার ফর্দ মানে পঞ্চাশ টাকা, পাঁচ মণ কয়লা পনেরো টাকা। দশমী এবং দ্বাদশীতে বিধবাদের জলযোগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সুতরাং তারা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য মুখবুজে একপাশে সরে থাকেন। লতিকা সেটি লক্ষ্য করে। তার নিজের সম্বল কিছু নেই, মাত্র কয়েকখানা অলঙ্কার। ইতিমধ্যে গোপনে ঠিকে-ঝির সাহায্যে সে কানের এক জোড়া ফুল বিক্রয় ক'রে যে টাকা পেয়েছিল সেই টাকায় সে শাশুড়ীদের জন্য কিছু চাল এবং থান কাপড় আনিয়ে রেখেছে। ছোট ননদের জামা নেই, সায়া

নেই,—সুতরাং লতিকা নিজের তোরঙ্গ খুলে কিছু কিছু তার জন্য বা'র ক'রে দিয়েছে।

খরচপত্র নিয়ে মধ্যে মাঝে গোলযোগ ঘটে, মনোমালিন্য বাধে—তাই লক্ষ্য ক'রে লতিকার মাথা কাটা যায়। খুড়শ্বশুর মহাশয় একটু আত্মকেন্দ্রিক, তিনি ঘরকন্যার সাতপ্যাচে থাকেন না; নিজের খরচ ছাড়া আর কোনো খরচ দেন না। এদিকে বড় বৌদিদির সঙ্গে প্রতুলের তেমন বনিবনা নেই। বাড়ীতে সকলের মিলিয়ে দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে, তাদের খরচ বড়দের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। লতিকা তাদের ভার নিয়েছে। এক সংসারে একই হাঁড়িতে থেকে বিশেষ কোনো পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা সম্ভব নয়, শোভনও নয়। মাছ, দুধ, ঘি, চিনি ইত্যাদি এ সবগুলো সকলের পাতে সমানভাবে পরিবেষণ না করলে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগে। বিধবাদের রান্না আলাদা হয়, তাঁরা আড়ালে ব'সে অবেলায় কী যে খান্, সেটা আলোচনা করতেও লজ্জা হয়। তাঁরা ভাতে ফ্যান্ রেখে দেন যাতে পরিমাণটা বাড়ে; তরি-তরকারীর শেষাংশ অথবা খোসা তাঁদের ভোজ্য; কচুর ডাঁটা অথবা ডাঁটা শাক রাধলে অনেকখানি হয়—এতে তাঁদের সুবিধা। লাল কুমড়া, ডুমুর, থোড়, মোচা—এগুলির কোনোটা যদি কোনোদিন পাওয়া যায়, তবে বিধবাদের সেদিন খাদ্যবিলাস। তাঁরা সকাল সকাল খেতে বসেন না, পাছে ওবেলার ওদিকে ক্ষুধা পায়—সুতরাং বেলা তিনটা চারটায় অন্নগ্রহণ করলেই তাঁদের সুবিধা। এইভাবে চোদ্দদিন পরে একাদশীর দিনটিতে তাঁরা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন—কারণ এই দিনটিতে গঙ্গাস্নান ক'রে গত চোদ্দদিনের অপমান ও আত্মগ্লানির দাগ তাঁরা গঙ্গার জলে ধুয়ে আসেন। একাদশীতে তাঁদের আত্মসম্মান রক্ষা হয়!

তাদের জীবনযাত্রার দিকে তাকিয়ে লতিকার চোখে জল আসে। ঘরকন্নার উপরে দিনে দিনে কেমন একটা রুক্ষতা ও দারিদ্র্যের ছায়া নামতে থাকে। দিনগুলি যেন শোচনীয় হয়ে ওঠে। পুরণো সাজ। সজ্জাগুলি নষ্ট হয়ে এলো, কিন্তু নতুন কোনো সামগ্রী আর আসতে চায় না—তাদের ভয়ানক দাম। ভাঁড়ারের হাঁড়ি কুঁড়ি ভেঙ্গে গেছে, তরকারি কোটার বঁটি নেই, একটি খুন্তি দরকার, গোটা চারেক চায়ের পেয়ালা—কিন্তু এসব কে আনবে? চাঁদা দেবে কে? লেপ, তোষক, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়—এ সবগুলোর দিকে আর তাকানো যায় না। মাথায় দেবার নারকেল তেল দুষ্প্রাপ্য; ভালো একখানা সাবান প্রায় স্বপ্নবৎ। ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, সেটা সারাতে দিলে নাকি পঁচিশ টাকা। ইলেকৃট্রিকের গোটা তিনেক বাল্‌ব দরকার—চোরা বাজারে এক একটির দাম নাকি তিন টাকা। কলকাতায় সম্প্রতি মশা হয়েছে—গোটা দুই যেমন তেমন মশারি কিনতে গেলে বেণুর এক মাসের মাইনেটা যায়।

লতিকা তা'র কপালের টায়রাটা একদিন বিক্রি করলো। বাড়ীর ছেলেপুলেদের পরণে জামা কাপড় একেবারেই নেই। সুতরাং টায়রা বিক্রির টাকা দিয়ে লতিকা বেণুর সাহায্যে জামা-কাপড়গুলি আনিয়ে দিল। তা'র সঙ্গে শাশুড়ীর জন্য খানিকটা নারকেল তেল ও কাপড় কাচা সাবান।

কথাটা প্রতুলের কানে উঠলো। সে রাগ ক'রে বললে, যেদিন তোমার একটিও গয়না থাকবে না, সেদিন চালাবে কেমন ক'রে বলতে পারো?

লতিকা বললে, যুদ্ধ কি চিরদিনই চলবে?

প্রতুল বললে, তর্কের দরকার নেই। তবে একথা মনে রেখো যুদ্ধ থামবার পর অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে।

লতিকা বললে, তার মানে ?

প্রতুল বললে, যে-জ্বরে রোগী ছটফট করে, সেই জ্বর ছাড়লে রোগীর নাড়ী ছেড়ে যায়। তখন তাকে বাঁচানো কঠিন।

লতিকা চুপ করে রইলো। প্রতুল বললে, আমি খেটে-খেটে মরছি, অথচ কুলোতে পাচ্ছিনে, আর তুমি কিনা ফস ক'রে গায়ের গয়না খুলে দিলে !

লতিকা নতমুখে বললে, টায়রা আমি পরিনে !

প্রতুল বললে, টায়রাটা নয়, ওর সোনাটা। আমার দায় ধাক্কা নেই, ছেলেপুলে নেই—আমি সংসারের জন্যে অত দিতে যাই কেন ?

লতিকা মুখ তুলে বললে, তোমার এসব কথার মানে জানো ?

জানি। এসব ঘর ভাঙ্গার কথা, এই ত' ?

ঘর একবার ভাঙ্গলে আর গড়বেনা, তা জানো ?

তাও জানি। তা'বলে যথাসর্বস্ব খুইয়ে পথে বসতে পারিনে। তোমার দান খয়রাৎ একটু থামাও, তা'হলে বাধিত হই। যারা উপার্জন করেনা, তাদের দানেরও অধিকার নেই।—এই ব'লে প্রতুল মুখ ফিরিয়ে বসলো।

লতিকা হেসে ফেললো। বললে, তুমি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছ। এটা দান নয়, এটা জীবনমরণের কথা। তোমরা কোন খবরই রাখোনা, কেমন করে এতবড় সংসার চলে কিছু জানোনা, তোমার কানে তুলতেও চাইনে।

প্রতুল অধীর হয়ে বললে, আমাকে তুমি বোঝাবার চেষ্টা করো

না, লতিকা। আমি যা আনি, তা'তে আমাদের দু'জনের বেশ ভালো ভাবেই চলে।

লতিকা বললে, এটা স্বার্থপরতার কথা। এক জায়গায় থেকে সকলকে বাদ দিয়ে নিজেরা ভালোভাবে থাকবো, সেটা ইতরমো। তা সম্ভব নয়।

প্রতুল বললে, বেশত, এতই যদি তুমি মহৎ—চাকরী ক'রে টাকা আনো না কেন? মেয়েদের চাকরী আজকাল ছড়াছড়ি।

লতিকার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না।

নিজের প্রস্তাবটাই যেন কিছুদিন ধরে প্রতুলকে পেয়ে বসলো। সে যা টাকা আনে, সেটায় কোনোমতে চ'লে যায় বটে—তবে তার পরিমাণ এমন কিছু নয়। দিন কাল খুব মন্দ, জিনিষপত্র দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। কোনো জিনিষ কনট্রোল হলেই বাজার থেকে সেটা অদৃশ্য হয়ে চোরাবাজারের সুড়ঙ্গপথে গিয়ে ঢোকে। সামনে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। জাপানীদের বোমাবর্ষণ আর আক্রমণের ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অনিশ্চিত। আপিস থেকে রেশন পাওয়া যায়, তাতে কুলোয় না। এ ছাড়া প্রতিমাসে সংসারের দেনা বাড়ছে, প্রতি সপ্তাহে খরচের মাত্রা বাড়ছে, এবং প্রতিদিনের জীবনযাত্রা দুরূহ হয়ে উঠছে।

লতিকা লেখাপড়া জানে, এবং অনেকটা জানে। তা'র ইংরেজী হাতের লেখা ভালো, বানান শুদ্ধ,—ইংরেজী ভাষা কেউ বললে বুঝতেও পারে। লতিকা যদি চাকরি করে কেমন হয়? তাদের পুরুষানুক্রমে কোনো মেয়ে উপার্জন করেনি, চিরদিনই এ বংশের মেয়ে আর বউরা পরের গলগ্রহ। তা'রা দুজনে মিলে যদি টাকা আনে মন্দ কি? যদি কেউ নিন্দে করে ত করুক। নিন্দুকরা ত আর

তাদের দরিদ্র সংসারটা চালাতে আসছে না। তাছাড়া এই যুদ্ধের যুগে যখন সবই উলটে যাচ্ছে, সব ব্যবস্থা আর শৃঙ্খলা যখন ভেঙ্গে পড়ছে—তখন তাদের ঘরকন্নায় যদি কিছু অভিনবত্ব আসে, ক্ষতি কি? লোকনিন্দার পরোয়া করে কে এ যুগে? আত্মীয় কুটুম্বের কটাক্ষের মূল্য কি?

প্রতুল একদিন আপিস থেকে ফিরে এসে বললে, লতিকা শোনো। দুজনে বারান্দায় এসে বসলো। প্রতুল বললে, সত্যি চাকরী করবে তুমি?

লতিকা বললে, কী যে বলো!

প্রতুল বললে, আমার এক কনট্রাকটর বন্ধুর সঙ্গে সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের এক সায়েবের খাতির আছে। লোকটা মেজর। বেশ লোক। তুমি যদি রাজী থাকো বন্ধুটি চাকরি করে দিতে পারে।

লতিকা ভীতকণ্ঠে বললে, আমি জানি কী যে চাকরি করবো?

যেটুকু জানো ওতেই হবে—তুমি নন ম্যাট্রিক! একখানা সার্টিফিকেট আমি যোগাড় করে দিতে পারবো! বেশ ত, চাকরি করবে টাকা আনবে—প্রতুল যেন মনে মনে সুখের স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

লতিকা বললে, আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে···শহরের কায়দা কানুন কতটুকু জানি? তাছাড়া চাকরি করতে যাবো, ঘরকন্না দেখবে কে?

প্রতুল একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললে, ওসব ভাবতে গেলে কোনো কাজ করা চলেনা। ওসব তোমাকে ভাবতে হবেনা।

লতিকা বললে, তুমি কি বলতে চাও, ভাসুর খুড়শ্বশুর আর শাশুড়ীদের সামনে দিয়ে রোজ সকালে গটগট ক'রে বেরিয়ে যাবো চাকরি করতে?

প্রতুল বললে, হ্যাঁ, তাই যাবে। কালস্য কুটিলাগতি! তুমি একা নয়, আজকাল বহু মেয়ে যায়। আজকাল সব গৃহস্থ ঘরে অভাব আর অনটন, নিন্দে করবার কেউ কোথাও নেই। বলো, রাজি কিনা।

লতিকা নানাবিধ তর্কের অবতারণা করলো। কিন্তু প্রতুল বললে, থাক অনেক কথা বল্‌বে তুমি, ওসব আমি শুনতে চাইনে। আমি সেই বন্ধুটিকে কথা দিয়ে এসেছি, সে তোমার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করছে।

লতিকা চুপ ক'রে গেল।

দিন তিনেক পরে প্রতুল একদিন অন্দর মহলে এসে দাঁড়ালো। সেখানে প্রফুল্ল, অমলা, শাশুড়ী, প্রসন্ন, প্রতাপ সকলেই উপস্থিত। প্রতুল বললে, মা, তোমার সেজ বৌয়ের জন্যে আমি একটা চাকরি ঠিক করেছি, সামনের সোমবার থেকে সে চাকরিতে জয়েন করবে, তোমরা যেন অমত করো না।

সকলেই স্তম্ভিত! মা বললেন, ওমা, সে কি রে?

প্রতুল বলে, হাঁ মা চাকরিই করবে। সংসারের অবস্থা এতই খারাপ যে, যতটা পারা যায় বাইরে থেকে আনা উচিত।

মা বললেন, কিন্তু বংশে কোনো মেয়ে চাকরি করেনি যে রে!

প্রতুল বললে, কোনো এক পুরুষে কেউ একজন পথ দেখায় ত!

ভাসুররা ও খুড়শ্বশুর নতমুখে যে যার ঘরের দিকে চ'লে গেলেন। পিসিমা গালে হাত দিয়ে ব'সে রইলেন। মায়ের মুখে আর কথা নেই। তিনি কেবল ভাবছিলেন, এক দিকে পরিবারের দুর্নাম এবং অন্যদিকে এই সংসারের ক্রমবর্দ্ধমান অভাব অভিযোগ। একটা দোটানা সমস্যা।

লতিকার নামে সেদিন হলদে রংয়ের এক লম্বা খামে সরকারী চিঠি এলো। সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কয়েকটি জরুরী বিভাগের একটিতে তার চাকরী হয়েছে। আগামী কি একটা তারিখে ঠিক সকাল সাড়ে ন'টায় তা'কে হাজিরা দিতে হবে। বেতন মাসে আটষট্টী টাকা এবং বাইশ টাকা দুর্মূল্য ভাতা,—অন্যান্য সুবিধা সুযোগও পাওয়া যাবে। চিঠিখানা পড়ে উৎসাহে ও উত্তেজনায় প্রতুল যখন ঘরময় পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছে লতিকা তখন একখণ্ড পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে এক জায়গায় ব'সেছিল। কে যেন তা'কে অকূল অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একটি পরিবারের অভ্যস্ত চিন্তাধারা এবং প্রাচীন ও প্রচলিত সংস্কার ভেঙ্গে পড়লো। অনেক কাল থেকে যে বিশ্বাস এবং ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল এ যুদ্ধে সেটার পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কেউ অভিযোগ জানালো না, কেউ প্রতিরোধ করলোনা। অর্থ সমাগম সম্ভাবনায় সকলের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

লতিকা চাকরী করছে। সকাল ন'টায় তাকে সকলের আগে বেরিয়ে যেতে হয়। পরণে পরিচ্ছন্ন শাড়ী, পায়ে জুতো, হাতে একটি ছোট ভ্যানিটি ব্যাগ, মাথাটি পরিষ্কার আঁচড়ানো। সকালের দিকে তার সময় হয় না, শাশুড়ী নিজে তার জন্য রেঁধে দেন—এবং বিকালে ফিরবার পথে লতিকা বিধবা শাশুড়ীদের জন্য মিষ্টান্ন ইত্যাদি আনে,—যাবার সময় সে অনেক কষ্টে এবং ভীড় ঠেলে ট্রামে যায়,—আসবার সময় কোনোদিন হেঁটে, কোনোদিন বা বাসে। কিন্তু প্রতি মাসে সে চোদ্দ সের চাল, ছ'সের আটা দেড় সের চিনি—অল্প দামে পায়। সেগুলি বাড়ীতে আনতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়। প্রতুল যদি কোনোবারে গিয়ে দাঁড়ায় ত' ভালো নৈলে তা'কে একা রিক্সা ভাড়া

করে আনতে হয়। তা'র এই অধ্যবসায়ের জন্য প্রতুল তাকে খুব ভালবাসে।

নব্বই টাকা! একটি অল্প শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে মাসে নব্বই টাকা মোটেই কম নয়। নামে সই ক'রে মাইনেটা সে যখন হাতে ক'রে নেয় তা'র হাত কাঁপে। একমাস ধ'রে সে পরিশ্রম করেছে, এ কথাটা আর মনে থাকে না,—সে ভাবে টাকাটা যেন উড়ে এলো তা'র হাতে। মাইনের টাকাটা এনে সম্পূর্ণই সে স্বামীর হাতে দেয়, এবং বলে দেয়, ওটার একটা অংশ যেন শাশুড়ীর হাতে নিশ্চয় পড়ে। লতিকা তা'র শাশুড়ীর খুবই প্রিয়। লতিকা এদের পরিবারে একটি ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন ক'রেছে।

আপিসের ওই সাপ্লাই বিভাগের বিরাট দপ্তরের কোথায় যেন নীরেন কাজ করে। একদিন লতিকাকে সে খুঁজে বা'র করল। লতিকা তা'র বড়জায়ের এই ভাইটির সঙ্গে আগে তেমন কথা বলতোনা। চোখাচোখি হ'লে ঘোমটা দিয়ে সরে যেতো। এখন দু'জনেই এক আপিসে চাকরী করে, সুতরাং আর ঘোমটা দিয়ে স'রে যাওয়া চলে না। তা ছাড়া আপিসে যে সব বিবাহিত মেয়েরা চাকরী করে, তাদের ঘোমটার বালাই নেই। সকল সময়েই তারা অসঙ্কোচে পুরুষ কেরাণী ও কর্ম্মচারীদের সংস্পর্শে এসে কাজ করতে বাধ্য হয়; লজ্জা ও জড়তার কোনো কথাই ওঠে না।

নীরেন বললে, আপনার এই চাকরীটা নেওয়া আমি খুবই তারিফ করেছি। প্রতুল বাবু খুব বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। আপনি টিফিন খান কোথায়?

লতিকা বললে, টিফিন আমি খাইনে।

সে কি, ন'টা থেকে ছ'টা—খিদে পায়না?

লতিকা হাসিমুখে বলে, টাকার জন্মে চাকরি করতে এসেছি, খিদে পেলে চলবে কেন, নীরেন বাবু ?

নীরেন হা হা করে হেসে উঠলো। তারপর বললে, যাক এ ভালোই হোলো মাঝে মাঝে দেখা হবে! আপিসে যাতায়াতে খুব অসুবিধে হয়ত ?

লতিকা হেসে বললে, আসবার সময় যদি বা ট্রামে একটু জায়গা পাই যাবার সময় অসম্ভব। পাঁচটা থেকে সাতটা পর্য্যন্ত গাড়ীতে ওঠবারও উপায় থাকে না।

নীরেন বললে, আপনাদের সেকশনে সাহেব কে ?

লতিকা বলল, এই কিছুদিন ছিল ম্যাকজনসন, এখন আবার এসেছে মেজর কীথ !

কীথ ?—নীরেন বললে, একটু মাথা পাগলা না ?

ঠিক এখনও বুঝতে পারিনে। তবে আমাদের সুপার বেশ ভালো, বাঙ্গালী ভদ্রলোক। আমার কাজে অনেক সাহায্য করেন।

নীরেন বললে, কাজকর্ম্ম কেমন লাগছে ?

হেসে লতিকা বললে, ওই ত কাজ, টেলিগ্রামগুলো থেকে নাম নম্বর আর ঠিকানা মিলিয়ে রাখা—কিম্বা ডেস্‌প্যাচ ক'রে দেওয়া। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। অনেকগুলো কোড-নম্বর মুখস্থ হ'য়ে গেছে।

সেদিন নীরেনের সঙ্গে একত্রেই ট্রামে উঠে লতিকা বাড়ী ফিরে এলো। বাইরেটায় সে দেখে আসে জীবন বৈচিত্র্য, একটা উদ্দাম অধীর যুগের অতি দ্রুতগতি চেহারা, বাড়ীতে ফিরে দেখে সেই একটানা অবসন্ন সংসারযাত্রা। এমন শ্বশুরবাড়ী,—সত্যি বলতে কি, ছোটবেলা থেকে সে কল্পনাও করে নি। যুদ্ধ বাধবার ঠিক আগে তা'র বিয়ে

হয়, তখন শ্বশুরবাড়ীর বাতাসটা অনেকটা সহনীয় ছিল, কিন্তু এখন অভাবে অভিযোগে চাপা মনোমালিন্যে এবং স্বার্থসচেতন মনোবৃত্তিতে সেই শ্বশুরবাড়ীটা তা'র কাছে কেমন যেন বিষাদে ভরা—কোথাও আনন্দের কোনো আয়োজন নেই। সবাই যেন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন, দারিদ্র্যে নতমুখ; অভিমানে হাস্যবিমুখ। আলো জ্বলে না, হাসি শোনা যায় না, কলরব করে না, আলাপ সম্ভাষণ বোঝে না—কোথাও যেন প্রাণের সজীবতা নেই! সমস্ত দিনটা লতিকার আপিসে কাটে, যেন ভালোই কাটে,—বহু লোকের মধ্যে, বহু কাজে, বহু সংবাদে এবং বহুতর আলাপে। সাহেবরা আসে যায়, পুরুষ ছেলেরা ঘোর'ফেরা করে, মেয়েরা হাসিমুখে ব্যস্তসমস্তভাবে এদিক থেকে ওদিকে যায়—লতিকার মনে হয় সে যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাণকেন্দ্রটিতে ব'সে রয়েছে। স্বামীর কাছে সে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করে। স্বামীই তাকে এই পথে এনেছে, স্বামীর সুপরামর্শেই সে এসেছে। এখান থেকে সমগ্র পৃথিবীকে দেখা যায়। যুদ্ধ চলছে জগৎময়! ইউরোপ থেকে আলাস্কা, সাইবেরিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকা, পারস্য থেকে জাপান। পৃথিবী বিরাট, যুদ্ধ বিরাটতর। সেই বিশ্ব সংগ্রামের মাঝখানে লতিকা ব'সে রয়েছে। অনেক দেখছে সে, অনেক শিখছে, অনেক অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার। প্রতি মুহূর্তে তার কাছে এমন সব সংবাদ আসছে যা কেউ জানতে পারে না। যারা যুদ্ধ বাধিয়েছে, যুদ্ধ চালাচ্ছে, অথবা যুদ্ধে উৎসাহিত করছে, তারা সবাই মরুক—তাতে লতিকার কিছু এসে যায় না! সে এসেছে উপার্জ্জন করতে, সংসারের অনটন ঘোচাতে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে।

বাড়ী ফিরে সে যেন যেন ক্লান্তি বোধ করে। আগে করতো না,—

ফিরে এসে ঘরকন্নার অনেকটা কাজ সেরে স্বামীর কাছে বসতো। অনেক রাত পর্য্যন্ত স্বামীর কাছে সারা দিনের গল্প ব'লে যেতো। কিন্তু আপিসের সেই একই গল্প—শোনাতে শোনাতে উভয়ের কাছেই একঘেয়ে হয়ে এসেছে। মাসের পর মাস সে মাইনে আনছে, সংসারের অনেকটা সুবিধা হচ্ছে, কিন্তু কোথায় যেন সে স'রে যাচ্ছে ফিরে আসতে পারছে না। প্রথম প্রথম সে সন্ধ্যারাত্রের দিকে স্বামীর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসতো, অন্ধকারে কোনো কোনো বাগানে গিয়ে বসতো.—কিন্তু সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, পথে ঘাটে লোক মরছে, ভিখারীদের কাতর কান্নায় পথ ঘাট ছেয়ে গেছে, অন্ধকারে অনেক সময় মৃত দেহের গায়ে পা লাগে—সুতরাং লতিকা আর বেরোয় না। আপিস থেকে বাড়ী ফিরে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বসে এবং আনমনা ভাবে নানা গল্প করে যায়। কিন্তু শাশুড়ীরাও আধমরা—সারাদিন পরিশ্রমের পর তাঁদের চোখে তন্দ্রা নামে। লতিকা আর সেখানে বসে না। উঠে আসে নিজের ঘরে। প্রতুল গিয়েছে বন্ধু মহলে আড্ডা দিতে। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা খেয়ে দেয়ে ঘরে উঠেছে, জায়েরা রয়েছে নিজের নিজের ঘরে স্বামীর সঙ্গে। লতিকা একা একা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, কিম্বা ছাদে গিয়ে ওঠে, কিম্বা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। বাড়ীতে ফিরে এলেই সে বেকার—তার যেন সময় কাটে না!

সে যে চাকরি করে, টাকা আনে, রেশনের জিনিসপত্র এনে এই পরিবারকে অনেকটা সাহায্য করে, তার এই গৌরবের বৈচিত্র্যটাও দিনে দিনে পুরণো হয়ে এসেছে। এখন সমস্ত ব্যাপারটা নিত্য-নৈমিত্তিক। আগে আগে প্রতুল অনেকদিন তার আপিসের সামনে গিয়ে ছুটির সময় তার জন্য অপেক্ষা করতো, আজকাল সেও আর

যাবার সময় পায় না। প্রতুল বলে, তুমি আজকাল পথঘাট সবই চিনেছ, কোনো অসুবিধে নেই।

লতিকা বলে, না, কী আর অসুবিধে! এইত আসি যাই।

প্রতুল বলে এ মাসে তোমার হাত খরচ যেন একটু বেশি হয়েছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, একটু হয়েছে। হোক না! টাকা ত খরচের জন্যেই!

প্রতুল একবার তাকায় স্ত্রীর দিকে। আজকাল লতিকার মুখে চোখে কেমন যেন চাপা অভিমান আর ঔদাসীন্য,—তার সঙ্গে কিছু সূক্ষ্ম ঔদ্ধত্য। কিন্তু টাকা তার নিজের উপার্জিত, অনাবশ্যক খরচ করার কিছু অধিকার তার আছে বৈকি। দু'জনের মধ্যে কি যেন কোথায় একটু একটু খ'সে যাচ্ছে,—দুজনেই উপলব্ধি করে, কিন্তু ঠিক সেটার নিরীখ খুঁজে পায় না। কিছু একটা যেন চোখের সামনে দিয়ে স'রে যাচ্ছে। কোথায় একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রতুল বলে, যুদ্ধ থামলে তোমার চাকরি যাবে, তা জানো?

কি জানি!—লতিকা বলে।

তোমার কি তখনও চাকরি করার ইচ্ছে?

লতিকা বললে, মন্দ কি, তোমাদেরই সুবিধে।

টাকা রোজগার করা চিরকাল তোমার ভালো লাগবে?

লতিকা একটু হেসে বললে, রক্তের স্বাদ একবার পেলে বাঘিনী কি লোভ ছাড়তে পারবে?

প্রতুল যেন স্ত্রীর কথায় চমকে ওঠে। চোখের সামনে এখনো সমস্ত জীবন, সমস্ত ভবিষ্যৎটা! লতিকার এ মনোভাবটা একেবারে নতুন, তাদের কল্পিত জীবনযাত্রার আনন্দময় আদর্শটা যেন লতিকার নিজের কথাটাতেই মার খাচ্ছে। তবে কি প্রতুল অশান্তিকেই ডেকে

আনলো? কি জানি! কিন্তু সে স্পষ্ট দেখতে পায়, দু'জনের চিন্তাধারার মধ্যে কেমন একটা ব্যবধান দেখা দিয়েছে। কি যেন কাজের অছিলায় লতিকা উঠে যায়। প্রতুল পিছন দিক থেকে তাঁ'র চলার ভঙ্গীটাকে পরীক্ষা করে।

নীরেনের সঙ্গে লতিকার দেখা হয় আপিসে—টিফিনের সময় কিম্বা ছুটির পর। এখন দুজনের মধ্যে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। উভয়ে আত্মীয়তা রয়েছে, কিন্তু সেটা যেন অগোচরে। এখন দুজনে অনেকটা বন্ধু ও বান্ধবী,—চাকরীজীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। স্বামীর মনোভাবটা লতিকা বোঝে না, কিন্তু নীরেনের কথাবার্তা সে খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। নীরেন একটা মেসে থাকে, সেই মেসের বিশ্রী আহারাদির চেহারাটা লতিকার বুঝতে কষ্ট হয় না। তাদের সেকশনে কি হারে মাইনে বাড়ছে সেটা নিয়ে দুজনের আলোচনা হয়। একজন আর একজনকে নিজের কাজের হিসেবটা অতি সহজে বুঝিয়ে দিতে পারে। লতিকা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সারাদিন আর মাথায় ঘোমটা দেয় না।

হাতখরচটা তাঁ'র কিছু বেড়েছে, প্রতুল মিথ্যা বলেনি। দৈনিক একটা টাকা খরচ না করতে পারলে লতিকা খুসিও থাকে না। এ ছাড়া আপিসের অন্যান্য মহিলা কেরাণীদের সঙ্গে সমান পর্য্যায়ে তাকে থাকতে হয় বৈকি। সপ্তাহে অন্ততঃ তিনখানা শাড়ী তিনটে জামা। একই জুতো তাঁ'র ভালো লাগে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে গেলে একটু পাউডার লাগে, একটু সুর্মা, একটুখানি আবছা রং—এটা সব মেয়েই ব্যবহার করে। রাস্তায় লাগে দু'চারটে পয়সা,—কোনো মেয়ে ভিখারী, কোন অন্ধ অনাহারী। ভাল এক বাক্স সাবান, একটু সুগন্ধ তেল, মাথায় ফিতে, কাঁটা, একখানা বা চিরুণী—এসব যুক্তিহীন নয়।

নীরেন জানে, গত মাস থেকে লতিকার মাইনে কিছু বেড়েছে। প্রায় প্রতি ছয় মাসে এখানে মাইনে বাড়ে, কারো কারো তিন মাসে। মাইনে বাড়ার কথা লতিকা স্বামীর কাছে প্রকাশ করেনি, বাড়তি টাকাটা সে খানিকটা জমায়, খানিকটা খরচ করে। শ্বশুরবাড়ীতে সবটা দিলে তা'দ্বই বা চলবে কেন? তারও একটা ভবিষ্যৎ আছে। তা ছাড়া কোনো কোনোদিন মেয়ে বন্ধুদের একটু আধটু চা খাওয়াতে হয়, এখানে ওখানে যেতে হয়—তা'র খরচ আছে বৈ কি। নীরেনের সঙ্গে সে যায় মাঝে মাঝে বেড়াতে—খরচটা দু'জনেরই। সিনেমায় গেলে কখনও সে নীরেনের খরচে যায় না। প্রথমতঃ কুটুম্ব, দ্বিতীয়তঃ—এক আপিসের লোক তারা, বেতন উভয়েরই সীমাবদ্ধ। স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে বেরোলে অথবা সিনেমায় এলে অনেকটা যেন স্বামীর অধীন ও অনুগত থাকতে হয়; নীরেনের সঙ্গে এলে সমানে সমানে। কেমন একটা অখণ্ড স্বাধীনতা,—সহজ স্বাভাবিক চেহারা। লতিকার বেশ লাগে।

নীরেনের সঙ্গে তার চুক্তি আছে বাইরে তাদের গতিবিধি অথবা আলাপ আলোচনার কথা লতিকার শ্বশুরবাড়ীতে সে প্রকাশ করবে না; লতিকার মাইনে বেড়েছে এ সংবাদ যেন চাপা থাকে। বাড়ীতে দু'জনের দেখা হ'লে তা'রা যেন ঘনিষ্ঠতার পরিচয় না দিয়ে ফেলে। দু'জনে হাসি মুখে এই প্রকার একটা মৌখিক চুক্তি সম্পাদন ক'রে নিয়েছে। বুঝতে পারা যায় না, এই প্রকার বিশ্বাস বিনিময়ের শেষ পরিণামটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যুদ্ধের যুগের এইটি ব্যবস্থা, এটাকে মেনে নিতে হবে বৈকি।

ছুটির দিনে লতিকার ঘরের মধ্যে বসে থাকা ভালো লাগে না। প্রতুল যেন তাকে একটু অনাবশ্যক ফরমাস খাটায়। যখন তখন

খাবার জল দিতে বলে। অসময়ে চা চায়। খাবার কাছে বসতে বলে। পান চায় তিন চারবার। অর্থাৎ প্রতুল [illegible] চায় সে অবাধ্য কিনা, স্বামীর অনুগত কিনা, সংসারের কা[illegible] মন আছে কিনা। যাকে কথায় বলে, কেরাণী সুলভ [illegible]ত্তি। লতিকা মনের বিরক্তি মনেই চেপে রাখে।

সুতরাং সে স্থির করেছে, ছুটির দিনেও সে বাড়ীতে থাকবে না, তা'কে চাকরিতে যেতে হবে। সরকারি কাজ, অস্বীকার করার উপায় নেই। লতিকা সকাল সকাল কর্তব্যগুলি সেরে তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা ক'রে বেরিয়ে পড়ে। ছুটির দিনে তার এই বেরুনোটা প্রতুল একেবারেই পছন্দ করে না। প্রতিদিনই যদি লতিকাকে বেরিয়ে যেতে হয় কাজে, তবে পারিবারিক জীবনে তা'র শান্তি কোথায়? টাকা রোজগার করাই কি এত বড়? স্বামী কি কিছুই নয়?

লতিকা বেরিয়ে পড়ে। পথে বেরিয়ে কেমন একটা স্বস্তি ও মুক্তির নিঃশ্বাস নেয়। পথের বাতাস হাল্কা, পথটা উদার ও বিস্তৃত। ঘরের মধ্যে তা'র জীবনটা যেন বিড়ম্বিত হয়ে ওঠে। তা'র ছেলে-পুলে হয় নি, মস্ত সুবিধে, দায়ধাক্কা পোয়াতে হয় না। স্বামীর সংসারে টাকা এনে দিয়ে সে খালাস। আজকাল চেহারাটা দাঁড়িয়েছে এই, উপার্জন ক'রে শ্বশুরবাড়ীর লোককে খাওয়াবার জন্যই যেন তা'র বিয়ে হয়েছিল। সে যেন বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে শ্বশুর বাড়ীর একটা অহেতুক দাবী মিটিয়ে চলেছে। টাকার জন্যই যেন তাকে প্রয়োজন। বেশ, সেই ভাল। সে টাকাই দিয়ে যাবে নিয়মিত।

কোন কোন ছুটির দিনে সে খেয়ে বেরোয় না। বাড়ীর খাওয়াটা তার ভাল লাগে না। বরং ধর্মতলার মোড়ে এসে চৌরঙ্গী স্ট্রীটের

ওই ছোট্ট কেবিনটিতে নীরেনের সঙ্গে ব'সে খেতে তা'র ভাল লাগে। নীরেন আজও বিয়ে করেনি, সুতরাং বেশ আনন্দে আছে বলতে হবে। হোটেলের কেবিনে কাঁটা, চামচে, কাঁচের প্লেট, রুচিমাফিক আহার, দু'জনে ব'সে একান্তে গল্প করে খাওয়া,—সমস্তটাই যেন চমৎকার। ছুটির দিনে আপিস তাদের নেই, তারা দুজনেই পরামর্শ ক'রে বেরিয়ে এসেছে। কয়েকটা টাকা আছে সঙ্গে—এগুলো খরচ করা চাই। সিনেমা, হোটেল, নিউ মার্কেটে চানাচুর আর কেক, এটা-ওটা কেনা, তারপর ট্রামে পাশাপাশি ব'সে যাওয়া দক্ষিণদিকে—কেমন একটা অবাধ অগাধ মুক্তি। এক বছর আগে লতিকা এ জীবন কল্পনাও করেনি, এটা বিচিত্র। ছোটবেলায় ভবিষ্যতে যে ইন্দ্রজাল সে বুনেছিল—সেটা কী নির্বোধ, কী হাস্যকর! এর তুলনায় সেটা কিছুই নয়।

সারাদিন দু'টি সমবয়সী তরুণ-তরুণী মিলে পথে পথে ঘুরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেট্রোয় এসে দামী টিকিট কিনে ঢোকে। কি যেন এক-খানা ভাল নতুন বই। নীরেন তাকে গল্পটা বুঝিয়ে দেয়, লতিকা নীরেনের ইঙ্গিতগুলো শোনা মাত্র হৃদয়ঙ্গম করে। ঘণ্টা দুই পরে যখন তারা বেরিয়ে আসে, তখন কলকাতা ঘোর অন্ধকার। প্রেতের চক্ষুর মতো কোথাও কোথাও এক আধটা আলো দেখা যায়।

নীরেন বলে, আজ আমি তোমাকে পৌঁছে দিই, কেমন?

লতিকা বলে, দাও। তার কণ্ঠস্বর সারাদিন পরে এবার ক্লান্ত।

দু'জনে ট্রামে ওঠে, কিন্তু ট্রাম যেখানে এসে দু'জনকে নামিয়ে দেয়, সেখান থেকে বাড়ী প্রায় আট দশ মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ। লতিকা বলে, হাঁটতে আর ভাল লাগছে না।

নীরেন বলে, বেশ ত' রিক্সায় চলো।

দুজনে রিক্‌সায় ওঠে, ছোট জায়গাটিতে তারা গায়ে গায়ে বসে। লতিকার কেবল পথের ক্লান্তি নয়, যেন তার সারাজীবনের ক্লান্তিটা রিক্‌সার গায়ে এলিয়ে পড়ে। এ রিক্‌সাটা যদি বহুদূর অবধি চলে, সমস্ত রাত চলে, যদি আর কখনও না থামে, যদি এ জীবন থেকে ও জীবনে নিয়ে যায়—তাতে লতিকা আনন্দ পাবে। এই সুখের জীবনটাও তার কাছে অশান্তিতে ভরা, ওই দুঃখের আর যন্ত্রণার শ্বশুরবাড়ীটাও অশান্তিতে পরিপূর্ণ। রিক্‌সায় বসে লতিকার কান্না পায়।

বাড়ীর দরজায় নিঃশব্দে নেমে সে নীরেনকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। সমস্তটাই অন্ধকার—অমাবস্যার উপরে ব্ল্যাক আউট—সুতরাং কোথাও থেকে কেউকিছু দেখবে না। লতিকা হেলতে দুলতে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

বাড়ীটা অন্ধকার, ঘন অন্ধকার। নতুন শীত পড়েছে, সকাল সকাল সকলেই ঘরে গিয়ে উঠেছে। লতিকাও জুতোটা ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। প্রতুল তখন সিগারেট খাচ্ছে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে। শান্তভাবে সে প্রশ্ন করলো, আজ তোমার এত দেরি?

লতিকা বললে, অনেক কাজ জমেছিল।—এইবলে সে দরজাটা বন্ধ করে সটান বিছানায় গিয়ে উঠলো, এবং প্রতুলের গলাটা জড়িয়ে পাশে শুয়ে পড়লো।

প্রতুল প্রশ্ন করলো, খাবে না?

—না, ইচ্ছে নেই।

কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ। লতিকা স্বামীকে আর একটু আঁকড়ে ধরলো তার চোখে জল আসছিল। সে যেন আজ বহু দুর্গম থেকে ছুটে এসে স্বামীকে খুঁজে পেয়েছে, যেন ভয় পেয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে।

প্রতুল এক সময় বললে, এভাবে তোমার চাকরি করা চলতে পারে না, লতিকা।

লতিকা বললে, চাকরি না করলে চলবে কেমন করে?

—কতদিন এই ভাবে চালাবে?

—যতদিন চলে। তুমি চুপ করো, ওকথা এখন থাক।

স্ত্রীর কণ্ঠে স্পষ্ট প্রতিবাদ শুনে প্রতুল চুপ ক'রে গেল। সংসারের আর্থিক অবস্থা কল্পনা ক'রে উচুঁ গলায় কিছু বলার শক্তি সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

ঠিক্ তা নয়

সুনন্দা চাকরি পেয়েছিল তা'র দাদার জন্যই। বাবা মারা গেলেন সেই দুর্ভিক্ষের বছরেই,—একখানা মিলিটারি লরীর ধাকায় তাঁর অপমৃত্যু ঘটে। তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ে সুনন্দাকে আই-এ পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল মেয়েকে তিনি কোন বড় কলেজের অধ্যাপিকা করে তুলবেন। কিন্তু তিনি মারা যাবার পর সুনন্দার লেখাপড়া আর এগোতে পারলো না। অবস্থা তাঁর মোটেই ভাল ছিল না—ধার-কর্জ ক'রে অতিকষ্টে মেয়েটিকে কোনোমতে মানুষ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

ভগ্নীর বিয়ে দেবার ক্ষমতা সন্তোষের ছিল না। তাছাড়া লেখাপড়া জানা মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অভিরুচি অত্যন্ত সচেতন—সুতরাং সন্তোষ আই-এ পরীক্ষার টাকাটা জমা দিয়ে কোনোপ্রকারে সুনন্দাকে আই-এ পরীক্ষার পাসটা করাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুনন্দা পাস করতে পারেনি। মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন তা'রা তিন ভাই এক বোন। সন্তোষ বিবাহিত, তা'র স্ত্রী ও তিনটি ছেলে-মেয়ে। মেজভাই সুধীন ট্যুইশনি করে এবং ছোট ভাই সুবীর সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত প'ড়ে পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, আর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার কথা নিয়ে বন্ধুসমাজে মনোমালিন্য বাধায়।

চাকুরি-বাড়ির সকাল বেলাটায়ই যত সোরগোলের ভিতর দিয়ে

সুনন্দার তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরটাই সবটাকে ছাপিয়ে শোনা যায়। সন্তোষ স্নান করতে করতে হেসেই অস্থির—কেননা বিনা কারণে বিবাদ বাধাবার দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী মেয়েরাই। ওদিকে বেলা ন'টা বাজে, সময়ও কম, দশটা দশে আফিস পৌছান চাই। এদিকে ছেলে-মেয়েগুলো কান্নাকাটি লাগিয়েছে। ঝি বাজার এনেছে, তাড়াতাড়ি একটু মাছ কুটে না দিলে এ-বেলা হবিষ্যি! ডাল এখনও সাঁৎলানো হয়নি। এমন অবস্থায় সুনন্দার তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে সন্তোষ স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললে, সত্যিই ত, ওকে সাড়ে নটায় হাজির দিতে হবে··· তোমার মাছের জন্য ওর চাকরি যাবে বলতে চাও?

বড়বৌ বেরিয়ে এলো হাতে খুন্তি নিয়ে। ঘর্মাক্ত হাসিমুখে বললে, মাছ না খাইয়ে ওকে ছাড়বে কে শুনি? মাছ ছাড়া ওর খাওয়া রোচে কোন্‌দিন? সে হবে না, মাছ ওকে খেয়ে যেতেই হবে। ওই যা, আমার তেল জ্ব'লে যায় বুঝি—

বড়বৌ তাড়াতাড়ি চলে গেল। এমন সময় অগ্নিরূপিনী সুনন্দা এসে বললে, দাদা, তুমি এর একটা ব্যবস্থা করো···আমি কিছুতেই এ সব সহ্য করবো না—

সন্তোষ বললে, কি বল্‌ দেখি?

আমি যদি একবেলা না খেয়ে থাকি, তোমার বউয়ের কী বলো ত'? সকাল থেকে উঠে আমি একপাটি জুতো খুঁজে পাচ্ছি নে—!

সে কি রে?

সুনন্দা বললে, আমি ঠিক জানি বৌদি লুকিয়ে রেখেছে। ওর হাড়ের মধ্যে ভেল্‌কি আছে তা তুমি জানো?

সন্তোষ হাঁক দিল। বললে, হ্যা গো, তুমিও ত' কম নয়? দাও শিগ্‌গির ওর জুতো বার ক'রে?

বড়বৌ আবার বেরিয়ে এলো। বললে, আমি লুকিয়ে রেখেছি। কে বললে তোকে? তোর শরীর থেকে যদি ল্যাঙটা হারিয়ে যায়, তা'র জন্য আমি দায়ী?

সন্তোষ হা হা করে হেসে উঠলো।

সুনন্দা বললে, বৌদি, ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি—

কি করবি তুই আমার?—বৌদিদি বললে, ভাত খাবিনে এই ত? যা না দেখি ভাত না খেয়ে, তোর পেছনে পেছনে মাছ-ভাত নিয়ে যাবো তোর আফিসে! তোর সাহেবকে খাইয়ে আসবো!

সুনন্দা বললে, ওই চেহারায় আর সাহেবের কাছে যেতে হবে না!

কী এমন আমার মন্দ চেহারা?—তিনটে ছেলেমেয়েই না হয় হয়েছে, বাঁধন ত' আর ভাঙেনি!

সন্তোষ নতমুখে আড়াল দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে গেল। হাতঘড়িতে সময় দেখে সুনন্দা উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, বৌদি, আমার চাকরি যদি যায়, তাহলে তোমার রক্ষে নেই ব'লে দিচ্ছি—

বৌদি বললে, তবে আয়—আয় শিগ্‌গির ভাতে বসবি!

সুনন্দা বললে, যাবো না, যাও।

যাবিনে? এখুনি খুন্তি ছ্যাঁকা দেবো—দাঁড়া! আয় শিগ্‌গির, নৈলে এই হলুদ হাত লাগিয়ে দেবো তোর শাড়িতে—

আঃ—কী হচ্ছে? অসভ্য, জানোয়ার—আচ্ছা, আচ্ছা যাচ্ছি—

বড়বৌয়ের উৎপীড়নের চোটে সুনন্দা গিয়ে থালার সামনে বসলো। বললে, আর আমার আট মিনিট সময় আছে, তা জানো? কোথায় আমার জুতো রেখেছ বলো শিগ্‌গির—

বৌদি বললে, আগে ভাজা মাছ হাতে নে?

অভদ্র কোথাকার!—ব'লে সুনন্দা মাছের সঙ্গে ভাত মেখে মুখে

দিয়ে বললে তুমি ম'রে যাও—খুব ভালো হয়! আবার আমরা দাদার বিয়ে দেবো।

হাসিমুখে বৌদিদি বললে, আমি ম'লে ছেলেমেয়ে তিনটেকে মানুষ করবে কে? তুই?

সুনন্দা তাড়াতাড়িতে থালার ওপর ভাত ছিটকিয়ে বললে, আমার দায় পড়েছে! ভালো মেয়ে আনবো, সেই মানুষ করবে!

আচ্ছা বেশ! কিন্তু তুই যে চাকরি করতে যাস, তোকে রেঁধে দেবে কে?

সুনন্দা রুষ্টকণ্ঠে বললে, সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। ততদিন আমার মাইনে বাড়বে অনেক। রাঁধুনি বামুন রেখে দেবো।

এমন সময় সন্তোষ এসে খেতে বসলো। সুনন্দা কোনোমতে কয়েক গ্রাস ভাত গিলে উঠে পড়লো। ভাত ছড়ানো রইলো থালার উপরে। হাত ধুয়ে উঠে গিয়ে দেখলো তার দুপাটি জুতো যথাস্থানেই রয়েছে। জুতো পায়ে দিয়ে রাগে গদগদ করতে করতে সে যখন বেরিয়ে গেল, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রইলো তার পথের দিকে চেয়ে। সুনন্দা অত্যন্ত রগচটা মেয়ে, তার ওপর অবাধ্য—তার খেয়াল খুশি ইচ্ছা অনিচ্ছা তার স্বাধীন চলাফেরায় কেউ বাধা দিতে গেলে সংসারে অশান্তি বেড়েই উঠবে। সন্তোষ শান্তিপ্রিয় এবং তা'র স্ত্রী নির্বিরোধ—সুতরাং সুনন্দার সম্পর্কে তা'রা একটু সতর্কই থাকে। সুনন্দা অত্যন্ত আক্রমণশীল।

মাঝখানে কিছুদিন আগে সন্তোষ একটি পাত্রের খোঁজ এনেছিল। ছেলেটি কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করে। মাইনে আর অবস্থা দুই ভালো। দেখতে সুশ্রী। কিন্তু সুনন্দা তা'র বৌদিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে আপাতত তার পক্ষে বিয়ে করা কিছুতেই

সম্ভব নয়! সন্তোষ ভগ্নীর অভিমত শুনে চুপ ক'রে গিয়েছে। বৌদিদি বিশেষভাবে ননদকে পীড়াপীড়ি করে না।

সুনন্দা চাকরি করে সাপ্লাই বিভাগে। চাকরিটি ক'রে দিয়েছে তা'র দাদা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে। আজকাল যুদ্ধের যুগে মেয়েদের পক্ষে চাকরি পাওয়া সহজ। বিশেষ ক'রে সুনন্দার মতো মেয়ে—যারা পাস করা, এবং ইংরেজি জানা। চুরানব্বই টাকা সুনন্দা মাইনে পায়,—এবং অফিসের কানাকানি থেকে সে জানে, অদূর ভবিষ্যতে মাইনে তা'র বেড়েই চলবে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মাইনে এ অফিসে নাকি তাড়াতাড়ি বাড়ে। চাকরিটি সুনন্দার খুবই প্রিয়; চাকরিটিকে সে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে এবং বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে লালন করে। সে মনে করে তা'র বাবা জীবিত থাকলে অবশ্যই তা'র এই উন্নতিতে সুখী হতেন।

মাস কাবার হ'লে সুনন্দা তিরিশটি টাকা বৌদিদির হাতে এনে দেয়। বাকি টাকার হিসেব দাদা অথবা বৌদিদি কেউই নেন না। অন্যান্য খরচ সবই সুনন্দার নিজের। সে প্রায়ই ভালো ভালো শাড়ি কেনে, সুবীরের হাত খরচ যোগায়, সাবান, তেল কিনে আনে, মাঝে মাঝে দেখা যায় তা'র হাতে নতুন নতুন ভ্যানিটি ব্যাগ। সুবীরের ঘরে এগুলি বিলাসিতা সবাই জানে, সুনন্দাও জানে,—কিন্তু চাকরি-করা মেয়েদের পক্ষে এগুলি প্রয়োজন। এগুলি না হ'লে মেয়েদের পক্ষে বাইরে যাওয়া চলে না। তা ছাড়া গরীবানা চালে থাকা তার আত্মমর্যাদায় বাধে।

একদিন সুনন্দা একজোড়া নতুন স্লিপার কিনে নিয়ে এলো। অনেক দাম নিয়েছে, সন্দেহ নেই। তা নিক্, টাকা সে রোজগার করবে, অথচ খরচ করবে না—এ হ'তে পারে না। টাকা খরচেরই জন্য।

বৌদিদি বললে, এই নিয়ে তোর ক'জোড়া জুতো হোলো বলতো ?

সুনন্দা তা'র পছন্দসই জুতো জোড়াটি নাড়াচাড়া ক'রে বললে, হোলোই বা, হোক না ?—রোজ এক-এক জোড়া পায়ে না দিলে ভালো লাগে না।

বৌদিদি বললেন, কত দাম নিল ?

সুনন্দা বললে, পনেরো টাকা। আসল ইজিপশিয়ান্ চামড়া, তা জানো ?

বৌদিদি বললেন, জুতোর চামড়ার আবার জাত আছে নাকি ?

ওমা, তা নেই ? তুমি কিচ্ছু জানো না—সুনন্দা বললে এই জন্যেই দাদা তোমাকে বাঙাল ব'লে ঠাট্টা করে।

বৌদিদি বললেন, হুঁ আমি বাঙাল। কম খরচে চালাই, বাবুগিরি নেই, মুখে রং মাখিনে—সুতরাং আমি বাঙাল। আচ্ছা বেশ। আর ওই যে অতগুলো শাড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিস, আর জামাগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে,—ওগুলোর দাম লাগেনি ?

সুনন্দা সলজ্জভাবে বললে, তুমি গুছিয়ে তুলে রাখোনি কেন ?

আমি তুলে রাখবো ? আমি কি তোর বিনা মাইনের ঝি ?

বেশ, আমি মাইনে দেবো, কত চাও বলো ?

বৌদিদি হেসে বললেন, তোর মা গেছেন তখন তোর বয়স দু'বছর, সুবীরের তিনমাস,—আমি-যে তোদের মানুষ ক'রে তুলেছি আগে তা'র দাম দে ?

সুনন্দা রাগে উত্তেজনায় একেবারে দিশাহারা হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ উঠে বৌদিদিকে জড়িয়ে তা'র গলা টিপে ধ'রে বললে, আজ মেরেই ফেলবো, আজ গলা টিপে শেষ করবো তোমায়। মাগি, এত লোভ তোর ? বল্ মানুষ করার জন্যে কত টাকা চাস্ ?

বৌদিদি সহাস্যে বললেন, আগে গলাটা ছাড়, [illegible] বলছি—

ননদের অত্যাচার থেকে মুক্তি নিয়ে বৌদিদি [illegible]য় বললেন, ধর, মাসে পঞ্চাশ টাকা,—তাহ'লে আজ এই আঠারো বছরে কত হয় ?

সুনন্দা শিউরে উঠে বললে, ওরে বাবা, এ যে সারাজীবন চাকুরি করলেও শোধ হবে না বৌদি ?

তবে চুপ ক'রে থাক্‌ পোড়ারমুখি !—ব'লে বৌদিদি উঠে গেল।

কিছু টাকা সুনন্দার তহবিলে জমেছিল। সেইদিনই সে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং সন্ধ্যার পরে সে প্রচুর জামা, কাপড়, সাবান, তেল, খেলনা ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি ফিরলো। বললে, বৌদি, এসব তোমার।

বৌদি অবাক হয়ে বললে আমার ? মানে ?

হ্যাঁ, তোমার। আমায় তুমি ক্ষমা করো।

বৌদিদি হাসিমুখে বললে, কিন্তু একদিনেই যে তুই দেনা শোধ ক'রে ফেললি ?

সুনন্দা বললে, আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না।

আচ্ছা দেবো না। কিন্তু একটা মানুষ, এতগুলো কাপড় জামা নিয়ে করবো কি রে ?

বেশ ত, আমাকে এক আধখানা দিয়ো ?—এই ব'লে সুনন্দা চ'লে গেল।

মেয়েটি স্বভাবসরল, মিষ্টপ্রকৃতির—কিন্তু অত্যন্ত একগুঁয়ে ; তা'র স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেই সে আগুন হয়ে ওঠে। শাসন সে কা'রো মানবে না, কা'রো তোয়াক্কা রাখবে না,—অথচ নিজে থেকে ধরা দিতে সে জানে। ননদের অনেক দৌরাত্ম্য বৌদিদি নিঃশব্দ

হাসিমুখে সহ্য ক'রে যায়। আজ নয় কাল নয়, কিন্তু একদিন সুনন্দার বিয়ে হবেই। সেদিন যে বৌদিদির পোড়া চোখ দুটো শুকনো থাকবে না—একথা বৌদিদি বেশ জানে।

মেজভাই সুধীন অত সাতে পাঁচে থাকে না। সে ট্যুইশনি করে দিনে চারটে, ঘরের কোণে বই-কাগজ নিয়ে পড়াশুনা করে দিনরাত, মাসিকপত্রে যখন তখন প্রবন্ধ পাঠায়, আর প্রতিমাসের প্রথম দিকে বৌদিদির হাতে পঞ্চাশটি টাকা দেয়। ছোট ভাই সুবীর সকালবেলা উঠে রাগারাগি করে কোনোমতে বাজারটা সেরে দেয়। হাত খরচের দরকার হ'লে বৌদি কিংবা ছোড়দির কাছে হাত পাতে, অথবা বাজারের পয়সা থেকে কিছু সরিয়ে রাখে। আজকাল সে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে হোটেলে ব'সে চা খেতে শিখেছে।

সুধীন একদিন সুনন্দাকে বললে, তুই চাকরি করিস, আর কি করিস শুনি?

প্রশ্নটা অত্যন্ত বিরক্তিকর, সুধীনও জানে। তিক্তকণ্ঠে সুনন্দা বলে, আর যাই করি, বাজে প্রবন্ধ লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাইনে।

সুধীন বললে, ওতে বিদ্যেবুদ্ধি লাগে,— ওকথাটা থাক্।

সুনন্দা জ'লে উঠে বলে, একটা লেখাও ত' তোমার ছাপা হয় না, বিদ্যেবুদ্ধিটা সম্পাদকদের বোঝাতে পারো না কেন?

সুধীন বললে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকিসনে ব'লে দিচ্ছি। আফিস থেকে বেরিয়ে তোর ফিরতে দেরি হয় কেন? আমার বন্ধুরা কত কথা বলে তা জানিস?

তোমার বন্ধুরা হ্যাংলার মতন আমার পিছু নেয় কেন? তাদের বুঝি কিছু চোখে পড়ে না?

সুনন্দা চেঁচিয়ে বললে, যদি কিছু পড়ে থাকে, পড়ুক। তোমার বন্ধুদের বলো, আমার পেছনে যেন গোয়েন্দাগিরি না করে।

বেশ, আমি দাদার কানে তুলবো। দেখি, তিনি কি বলেন।

—এই ব'লে সুধীন জুতোটা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পিছন থেকে অগ্নিমূর্তির মতো সুনন্দা উচ্চকণ্ঠে বললে, দাদার ভয় আমাকে দেখিয়ো না তুমি। আমি কাউকে পরোয়া করিনে। নিজে রোজগার করি, টাকা আনি—আমি তোমাদের গলগ্রহ নই। বেশি বললে মান থাকে না মনে রেখো।

সন্তোষ বাড়ি ছিল না, কিন্তু ওঘর থেকে বৌদিদি সুনন্দার কথাগুলি কান পেতে শুনে খুব হাসতে লাগলো। আশ্চর্য ওই মহিলাটি, সুনন্দার কোনো কথাতেই তিনি আঘাত পান না।

একদিন সুধীন বলেছিল, বৌদি, তুমিই ওর মাথাটি খেয়েছ।

বৌদিদি বললে, তুই ওর কথায় থাকিস কেন রে?

থাকবো না? লোকের নিন্দে আমাদের কানে আসে না?

তোদের কানগুলো এতবড় কেন? তোরা কোন্ জীব বল্ ত?

সুধীন রেগে আগুন হয়ে বললে, তোমার আস্কারাতেই সুনন্দা মাটি হয়ে যাচ্ছে। আজকাল কি রকম স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, তা জানো তুমি? ও যা খুশি তাই ক'রে বেড়াবে, তুমি বলতে পারো?

বৌদিদি বললে, মেয়েরা একটু এদিক ওদিক হ'লেই তোদের গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়, না রে?

তোমার কথার কোনো মানে খুঁজে পাইনে। —ব'লে গরগর করতে করতে সুধীন বেরিয়ে চ'লে গেল। তা'র পিছন দিকে চেয়ে বৌদিদি প্রাণের আনন্দে হাসতে লাগলো। দুইটি দেবর ও ননদকে সে নিজের হাতে মানুষ ক'রে তুলেছে। ওদের কোনো কথাতেই

বৌদিদি চঞ্চল হয় না। যদি ভাইবোনদের সত্যিই কোনো অপরাধ প্রকাশ পায়, তবে সে-অপরাধ, তা'র নিজের—বৌদিদি একথা বেশ জানে।

রাত্রের দিকে সেদিন সন্তোষ বললে, তোমার ননদের ব্যাপারটা কি, বলো ত?

বৌদি বললে, কেন?

সন্তোষ বললে, যা খুশি তাই করে, যা মুখে আসে তাই সবাইকে বলে—ওর হয়েছে কি?

বৌদি সহাস্যে বললে, তোমাদের হয়েছে কি, তাই আগে বলো।

আমাদের আবার কি হবে?

কিছু হয়েছে বৈ কি। আসল কথা কি জানো? গেরস্থ ঘরের একটা সামান্য মেয়ে একটু লেখাপড়া শিখে হঠাৎ তোমাদের নাকের ওপর দিয়ে গিয়ে চাকরি করছে, এটা চোখে লাগে। সে জুতো পরে, ট্রামে ওঠে, তোমাদের সঙ্গে সমান পাল্লা দেয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ায়, একলা চলাফেরা করে পাঁচটা মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলে—এসব তোমাদের দেখা অভ্যেস নেই। তাই আজ অভ্যেসটা বদলাতে তোমাদের লাগছে। তোমরাই আমাদের অন্নদাতা হয়ে থাকবে চিরকাল—তোমাদের এই অহঙ্কারটা ভেঙে পড়ছে ব'লেই তোমরা এটা সইতে পারছ না,—বুঝলে?

সন্তোষের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। হঠাৎ নাকডাকার আওয়াজে বৌদি ফিরে তাকিয়ে নিজের মনেই হেসে উঠলো। তারপর উঠে সন্তোষের গায়ের উপরে পাতলা চাদরটি সযত্নে টেনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাস দুই আগে সুনন্দার মাইনে বেড়েছে একসঙ্গে পঁচিশ টাকা।

কিন্তু মাইনে যতই বাড়ুক, টাকা তা'র হাতে থাকে না। তা'র আফিসের একটি মহিলা একদিন তা'কে কাছে ডেকে বলেছিলেন, টাকা উড়িয়ে দিয়ো না সুনন্দা, কিছু জমিয়ে রাখলে তোমারই কাজে আসবে। ব্যাঙ্কে, কিংবা পোষ্ট আফিসে কিছু রাখো না কেন?

সুনন্দা বলেছিল, কি হবে রেখে?

মহিলা বলেছিলেন, বুদ্ধ চিরদিন থাকবে না ভাই।

সুনন্দা বলেছিল, এক টাকা দামের জিনিস পাঁচ টাকা হয়েছে, টাকা কেমন ক'রে থাকবে?

সেই সব জিনিস কেনা বন্ধ করে দাও।

সুনন্দা জবাবে জানিয়েছিল, নিজেকে কষ্ট দিয়ে টাকা জমানোটা ঘৃণা অভ্যাস! কৃপণের ধন থাকে না!

মহিলাটি আড়চোখে একবার তাকিয়ে চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়ার খবরটা বাড়ির লোকে আজো শোনেনি, কিন্তু সুনন্দার আফিসের বন্ধু সৌরীন জানতো। সৌরীন সুনন্দার সব খবরই রাখে। সত্যি বলতে কি, এই মাইনে বাড়ার ব্যাপারটায় সৌরীনের খানিকটা হাত ছিল, স্বীকার করতেই হবে। তাই সেদিনের ছুটির পর যখন এসপ্লানেড শেডের নীচে দুজনের দেখা হোলো, সুনন্দা বললে, আমার কৃতজ্ঞতার একটি চিহ্ন আজ তোমার হাতে বেঁধে দেবো।

হাসিমুখে সৌরীন বললে, মুখরার মুখ আজ এত গদগদ কেন? হাত বাঁধবে, না হাতে বাঁধবে?

সুনন্দাও হাসলো, তারপর ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে একটি নতুন হাতঘড়ি বা'র ক'রে ওই অত জনসমারোহের মধ্যেই সৌরীনের হাতে সে পরিয়ে দিল।

কত টাকায় উপহারটি কেনা হোলো ?

সে এমন কিছু নয়, চুপ করো তুমি।

সৌরীন বললে, বটে, তবু শুনি কত টাকা ?

একশো আশী।

আগে এটার দাম ছিল টাকা পঁচিশেক, বড় জোর তিরিশ! এত খরচ করলে কেন তুমি ?

সুনন্দা চোখ পাকিয়ে বললে, আবার ? চলো ট্রামে উঠি।

সৌরীন বললে, কোন্ দিকে ?

চলো, লোয়ারে,—নিরিবিলি সেই হোটেলটায়।

বুঝেছি বাকি টাকা ক'টা ফুঁকে দিতে হবে কেমন—বেশ, চলো, টাকা তোমার—আমি দিব্যি খেয়ে নিই। আবার এই শাড়িটা কবে কিনলে ?

সুনন্দা বললে, উঃ তুমি বড্ড বেশি হিসেব নাও! আজকাল কাগজে টাকা উড়ছে ধুনরীর তুলোর মতন,—হোক না একটু খরচ ?

সৌরীন বললে, কিন্তু ভাটিতে যখন টান ধরবে, তখন ?

সুনন্দা জবাব না দিয়ে ট্রামে চ'ড়ে বসলো। বললে, তোমার ফর্সা হাতে শাদা ব্যাণ্ড মানাবে,—তাই নিয়েছি শাদা ফিতে। পছন্দ হয়েছে ত ?

সৌরীন হাসলো। বললে, কেউ কিছু দিলে আমি তখুনি পছন্দ করি!

ফের আবার তামাসা ?

তোমার চাকরি-জীবনটাই ত' তামাসা সুনন্দা ? এতদিন চাকরি করলে, অন্তত পাঁচ-সাতশো টাকা তোমার জমানো উচিত কিন্তু উল্টে তোমার ধার হয়েছে প্রায় তিনশো! মন্দ নয়!

সুনন্দা বললে, তুমি বুঝি আমাকে কল্যাণীর মতন কৃপণ ভাবো ?

সৌরীন বললে, একথা ভুলো না যুদ্ধের বাজারে যারা কৃপণ থাকবে যুদ্ধের পরে তাদেরই বরাৎ খুলবে।

সুনন্দা বললে, এখন থাক্, তোমার অর্থনীতি। সেদিন তুমি পিক্‌নিকে গেলে না কেন, বলো ত ?

সৌরীন বললে, তোমার টাকায় বারোজন ভূত সেদিন খেলো, ত্রয়োদশ ভূত আমি নাই বা হলুম ? তুমি যত খাওয়াচ্ছ, তত দিচ্ছ,—তোমার এই দানছত্তর আর কদ্দিন ?

খুব সোজা কথা !—সুনন্দা বললে, যেকোনো চাকরি যখন তখন করতে পারি,—খেটে খাবো, রোজগার মারবে কে ?

এত বিশ্বাস নিজের ওপর ?

নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করিনে।

দুজনে হোটেলে এসে পৌঁছলো তখন প্রায় সন্ধ্যা। এদিকটা ফিরিঙ্গি পল্লী, দেশীয় লোকের উৎপাত কম। সকল সময়েই দুচারজন আমেরিকান্ সৈন্যের সঙ্গে দু'চারটি চীনা অথবা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে এই হোটেলে খেতে আসে। এপাশ ওপাশে এক আধজন ইংরেজ টমি কুণ্ঠিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে গেলাস মুখে তোলে। এ পাড়ায় আসতে সৌরীন সুনন্দার ভয় নেই, নিভৃত পল্লীতে না এলে তাদের আলাপ আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। তাদের ইচ্ছা যুদ্ধটা দীর্ঘদিন ধ'রে চলুক, তাদের ইচ্ছে জার্মানী যেন তাড়াতাড়ি না হারে—কারণ মিত্রশক্তি সহজে জয়লাভ করলেই তাদের চাকরিতে টান পড়বে। যুদ্ধের আগে গ্রাজুয়েট সৌরীন ত্রিশ টাকা পেতে পারতো, এখন আড়াইশো টাকা ; ম্যাট্রিক সুনন্দা কোনো ছোটো-খাটো মেয়ে ইস্কুলে বড় জোর পঁচিশ টাকা—এখন একশো পঁচিশ।

মিত্রশক্তির অবস্থা যত খারাপ হয়, ওদের মাইনে তত বাড়ে। হোক না চালের দাম চল্লিশ, চলুক না চোরা বাজার, যাক্ না সব জাহান্নামে, দেখা যাক্ না দেশময় দুর্নীতি,—ওদের এই মাইনেটা ঠিকই থাকবে, এই আশ্বাসটি পেলেই ওরা খুশি। বাঙালী আর কোন্ যুগে পেয়েছিল এত টাকা? ভাগ্যি জাপানীরা ভয় দেখিয়েছিল, ভাগ্যি গোটা দুই চার বোমা পড়েছিল কলকাতায়,—শাপে বর হোলো! সৌরীনের জানা আছে, তা'র পরিচিত ছেলেমহলে অন্তত আশীজন চাকরি পেয়েছে, আর সুনন্দার জানা পনেরো জন মেয়ে কাজ নিয়েছে নানা-দিকে। কেউ পেছে ডব্লিউ-এ-সিতে, কেউ পারস্যে গেছে নার্স হয়ে, কেউ ক্যান্টিনে, কেউ বা সেলস্‌উওমান্—সবাই মোটা টাকা পায়, কেউ ব'সে নেই। কাগজের টাকার বন্যা এসেছে—কেউ ভরাচ্ছে তা'র ডোবা, কেউ দিঘী, কেউ বা নতুন খুঁড়ে বন্যার জল ভরে রাখছে। যুদ্ধের জুয়ায় কেউ হোলো ফকির, কোনো ফকির হোলো আমীর। গরীবরা গুঁড়িয়ে গেল, ধনীরা হোলো কুবের।

শেষকালে ওঠে কল্যাণীর কথা। কল্যাণী কাউকে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত খাওয়ায় না। টাকা পয়সা আগলায় সে যক্ষীর মতন। দেড় বছর ধরে সে চাকরি করছে, একদিন একখানা নতুন শাড়ি তাকে পরতে দেখা গেল না। আফিস থেকে ফিরবার সময় সে নাকি ট্রামে ভিড়ের ভয়ে হেঁটে যায়,—কিন্তু আসল কথা, ট্রামের খরচটা সে বাঁচায়। সৌরীনের কাছে এই খবরটা পেয়ে সুনন্দা তা'র চায়ের পেয়ালায় হেসেই খুন। সুনন্দা বললে, কল্যাণীর কথা ভাবলেই আমার মাথা হেঁট হয়। ছেঁড়া শাড়ি থেকে টুকরো কেটে সে জামা বানায়। সংসার খরচ তার কতটুকু? ওই ত' বুড়ো বাপ, বিধবা পিসি, আর বিধবা

বোন। একবেলা খায় আর একবেলা চিঁ... ...। ওরাই মেয়ে-মহলের কলঙ্ক।

সুনন্দা বলে, আমি কারো পরোয়া করিনে।

সৌরীন বলে, তুমি বিয়ে করছ কবে?

বিয়ে! ননসেন্স! হাত পা ঠুটো না হ'লে আর বিয়ে করবো না। বিয়ে মানেই ত' পরকাল ঝরঝরে!

সৌরীন শুধু বললে, হুঁ, তা বটে। চলো, এবার উঠি।

সুনন্দা বললে, এরই মধ্যে? আর এক পেয়ালা চা নেওয়া যাক্।

পুনরায় চায়ের হুকুম ক'রে সুনন্দা এবার বেশ গুছিয়ে বসলো। সৌরীনকেও বসতে হোলো। হাতঘড়িতে দেখা গেল রাত আটটা বাজে। বাইরে ব্ল্যাক-আউটের রাত; জীপ-গাড়ি মাঝে মাঝে হু হু শব্দে পেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথের ধার দিয়ে অস্ফুট গান গেয়ে চলেছে আমেরিকানরা,—মাঝে মাঝে নারী কণ্ঠের চূর্ণ আওয়াজ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কোন্ দিকে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে।

সুনন্দা বললে, তুমি কবে বিয়ে করছ, সৌরীন?

সৌরীন বললে, যুদ্ধ থামুক আগে।

যদি দশ বছরেও না থামে?

তবে চিরকুমার!

সুনন্দা হেসে উঠলো। পরে বললে, আমার নিজের ই... হয়ে গেছে।

সৌরীন বললে, কি রকম?

সুনন্দা বললে, ভাইদের সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না আমি জানি। ওরা স্বার্থপর, কেবল হাত পেতেই থাকে, হাত উপুড় করে না। যদি রোজগার না করতুম, তবে তাড়িয়ে দিত বাড়ি থেকে—

এখন কী করবে ভাবছ ?

স্পষ্ট কিছু ভাবিনি। তবে—

তবে কি ?

সুনন্দা বললে, আর কিছু মাইনে বাড়ুক। একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া নেবো ভবানীপুরে,—মানে, তোমাদের পাড়ায়। ঠাকুর চাকর রাখবো, কোনো অসুবিধে হবে না।

সৌরীন বললে, একা থাকবে ? সঙ্গে ?

সুনন্দা বললে, নিঃসঙ্গ !

কী নিয়ে দিন কাটাবে ? সারাদিনত ত' আর চাকরি করবে না !

সে আমি জানি—সুনন্দা বললে, মেয়েরা একা থাকবে শুনলে তোমরা ভয় পাও কেন ? মেয়েদের অভিভাবক না হ'তে পারলেই তোমাদের গা গিসগিস্ করে, না ? হ্যাঁ, একাই থাকবো। দিব্যি গান-বাজনা গল্প-গুজব নিয়ে থাকব, বন্ধুবান্ধবেরা আনাগোনা করবে,—ধরো, তোমরাই না হয় গরীবের বাড়িতে মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দিলে—! আসল কথা কি জানো ? স্বাধীনতা না পেলে কোনো মেয়েই বাঁচতে পারে না।

সৌরীন হেসে বললে, আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি বাড়ির সবাইকেই চটিয়েছ, তাই না ?

সুনন্দা বললে, সত্যি বললেই বন্ধু বেগড়ায়। আমি কখনও অনাচার সইনে, সৌরীন। কিন্তু আমাকে রোজগার করতে দেখে সকলেরই গায়ের জ্বালা বেড়েছে, বুঝলে ?

বুঝলুম।

সুনন্দা বললে, চলো, এবার উঠি। ইস্, বাইরে ভারি অন্ধকার,—একখানা ট্যাক্সি নাও।

ট্যাক্সির অনেক দাম কিন্তু।

জীবনের দাম তা'র চেয়েও বেশি। ডাকো ট্যাক্সি—

সৌরীন সেদিন বাদুড়বাগান অবধি সুনন্দাকে পৌঁছিয়ে অনেক রাতে নিজে বাড়ি ফিরেছিল।

* * * *

খবর এসেছে সাপ্লাই বিভাগে—এখন থেকে দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানী করাটা বোধ হয় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মিত্রপক্ষের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং জয়লাভ সুনিশ্চিত। জাপানকে আর কোনো ভয় নেই, জার্মানীর পর সম্মিলিত শক্তির চাপে জাপানকে পদদলিত করতে কোনো বেগ পেতে হবে না।

সুনন্দা বালুর উপর প্রাসাদ তৈরি করেছিল। পারিবারিক নিন্দার অতিশয়োক্তি করেছে, সে অতিরঞ্জিত করেছে, নিজেকে অনেকখানি শূন্যে তুলে আকাশকুসুম রচনা করেছে, আত্মীয় পরিজনের মধ্যে মনোমালিন্য বাধিয়েছে। কিন্তু প্রদীপের তলাকার অন্ধকারটার দিকে তা'র চোখ পড়েনি, প্রাসাদের নীচেকার ভিতটাকে সে পরীক্ষা করেনি। চাকরিটাকে সে মনে করেছিল প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের কোটরের মতো স্থায়ী এবং নিরাপদ।

মিত্রশক্তির অবস্থার উন্নতিটা সাপ্লাই মহলে দুঃসংবাদ [illegible]দহ নেই। কেউ ঘর গুছিয়েছে, কেউ ফুটো চালা সারিয়ে নিয়েছে, কেউ বা ওটাকে একমাত্র আশ্রয় বলে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু গোপনে এরই মধ্যে নাকি সংবাদ এসেছে, শতকরা তেত্রিশ জনকে জবাব দাও। কারণ, হিটলারের পতনের পর অত লোকের আর দরকার নেই। জাপানের অবস্থাও মুমূর্ষু। তবে চাকরি যাদের যাবে, গভর্ণমেণ্ট

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের স্মরণ করবেন। ভবিষ্যতে তাদেরকে কাজ দেবার ইচ্ছা রইলো। অবিশ্যি নিরবধিকাল পৃথ্বি বিপুলা।

হঠাৎ সুনন্দার টেবিলের ওপর একখানা নোটিশ এসে পৌছুলো। কাগজখানায় একবার চোখ বুলিয়ে সুনন্দা সেখানা ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখলো। হাত কাঁপছিল তার। কেমন একটা প্রলাপজড়িত ক্ষোভ এলো তার মাথায়; যেন ঠিক শরীরের রক্ত চলাচলের আওয়াজটাই সে কানে শুনলো। পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই, দূরের ময়দানে আর কোনো রং নেই; চোখ দুটোর সামনে কেমন যেন বেগুনী বাষ্পোচ্ছ্বাস তাল পাকিয়ে উঠেছে। হাত দু'খানা তা'র পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পা দুখানা যেন চিরতুষারে আচ্ছন্ন,—আর যে-জায়গাটুকুর মধ্যে সে ব'সে রয়েছে, সেটুকু যেন এক পলকের ভূমিকম্পে মাটির তলায় কোথায় তলিয়ে গেছে। উপর দিকে ওঠবার জন্য যেন তার হৃদ্‌পিণ্ড আঁকুপাকু করছে।

আশেপাশে রয়েছে সবাই, কোনো কোনো কেরানি মেয়েপুরুষ বাঁকাচোখে চেয়ে রয়েছে তা'র দিকে; হয়ত কেউ হাসছে, হয়ত উদ্ধত মেয়েটাকে মনে মনে কেউ বিদ্রূপ করছে,—হয়ত চারিদিকের অপমানজনক কটাক্ষ তা'কে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে। তবু সুনন্দা আজ নিঃসঙ্গ। তা'র জন্য বলবার কেউ নেই, সমবেদনা জানাবার লোক নেই,—সমগ্র পৃথিবীটা যেন অসীম বিদ্রূপ। সমস্ত বিশ্বব্যবস্থার থেকে বিচ্যুত উৎক্ষিপ্ত এক টুকরো পাথরের মতো সে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো।

তার দাঁড়াবার জায়গা আর কোথাও নেই, এখানে ব'সে কোনো কথা ভাববার অধিকারও তা'র আর নেই,—তাকে এখনই চ'লে যেতে হবে। কোথায় সে যাবে জানে না, কোন্ পথে পা বাড়াবে তাও

অজানা, নিজেকে নিয়ে কী করবে তাও অপরিজ্ঞাত—সে বালুর ওপর ঘর বেঁধেছিল। অস্পষ্ট অনিশ্চিত অন্ধকার একটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সুনন্দা থরথর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। আত্মীয় পরিবারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে নারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কল্পনা তা'র কাছে স্বপ্নের মতো অলীক, অথচ বাইরের দিকেও তাকিয়ে দেখলো, তা'র সমস্ত অবলম্বন এক ফুৎকারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সে সর্বস্বান্ত।

ছুটির পর সেদিন সবাই গেল বেরিয়ে, সে ব'সে রইলো তার টেবিলে। সে কাগজ নাড়ছে, কী যেন লিখছে, কোন্‌টা যেন ভুল হয়ে গেছে, কোথায় যেন তা'র সই করা দরকার, এদিকের ফাইলটা গেল ওদিকে—কিন্তু আসলে সে উঠতে পারছে না। যে-চেয়ারখানা এতদিন তা'কে কোলে নিয়ে বসেছিল, সেই চেয়ারটিকে ছাড়তে কী ব্যথা তার। তবু তাকে এক সময়ে উঠতে হোলো। আফিস বাড়ি নির্জন; পাহারাদাররা এসে দাঁড়িয়েছে, ঝাড়ুদারে এখনই ঝাড় দেবে, জানালা দরজা বন্ধ হবে,—তা'কে চ'লে যেতেই হবে।

সুনন্দা শ্রান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। তখন প্রায় সন্ধ্যা।

পনের দিন তা'র হাতে সময় ছিল। বাড়ি থেকে বেরোয় সে ঠিক সময়ে, কথা বলতে সাহস পায় না বৌদিদির সঙ্গে, রুক্ষ মেজাজ কারো প্রতি প্রকাশ করে না, সাজসজ্জার দিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই,—অত্যন্ত সন্তর্পণে সে আনাগোনা করে। প্রশ্নসূচক দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়ে যায়, নিঃশব্দপদসঞ্চারে এসে সন্ধ্যার পর বাড়ি ঢোকে।

পনেরোটি দিন সমস্তক্ষণ তা'র কাটলো পথে পথে। যদি নতুন কোনো চাকরি পায়, তবে সম্মান বাঁচে। এ অফিস থেকে ও অফিস, এ-ট্রাম থেকে ও-ট্রামে, ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে চৌরঙ্গী, লোয়ার সার্কুলার থেকে খিদিরপুরের দিকে। যদি কেউ ডাকে, এখনই সে যাবে।

কোনো ধনী, কোনো অফিসের মালিক, কোনো অফিসার সাহেব, কোনো মিলিটারি কর্মচারী। সে প্রস্তুত, সর্বপ্রকার জরুরী ব্যবস্থার জন্য সে প্রস্তুত, তা'র আত্মসম্ভ্রমের বাঁধন আল্‌গা করতেও আজকে আর আপত্তি নেই। আজকে তা'র চাকরি চাই, টাকা চাই, জীবনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখার মতো একটা অর্থকরী আশ্রয় চাই। তা'র বিনিময়ে?—হ্যাঁ, সে রাজি আছে,—যেখানে হোক, যে-পথে হোক, যে-ভাবে হোক, নিজেকে ভাসিয়ে দিতে তা'র কোনো আপত্তি নেই।

কলকাতা শহরটা সে তচনচ করলো। অজস্র উমেদারী, অসংখ্য নৈরাশ্য। কেউ নেয় না তাকে, কেউ ডাকে না, কেউ আমল দেয় না। সে চললো বেহালা থেকে টালিগঞ্জ, বরানগর থেকে বারাকপুর, কাঁকুড়গাছি থেকে সাল্‌কিয়া। ছুটে বেড়ালো, সে যেন বিষের তাড়নায় স্ফুলিঙ্গের মতো ছিটকে বেড়াতে লাগলো,—এবার সে ছাই হয়ে নিবে যাবে। ঘরে নয়, পথে নয়, ঘাটে নয়,—তবে কোথা তা'র ঠাঁই? এই যুদ্ধ কোথায় তা'কে দাঁড় করালো? তা'র স্বভাবের এই বিকৃতি তা'র বিশ্বাসের এই ভাঙন, তা'র নৈতিক চেতনার এই অধোগতি, তার নারীজনোচিত চিন্তাধারার এই বিপ্লব, তা'র সমগ্র জীবনের ভবিষ্যৎটার এই বিরাট ওলোটপালট—এই যুদ্ধ কোথায় তা'কে টেনে আনলো? তা'র শ্রদ্ধাবোধ তার স্নেহ-চেতনা, তা'র শাস্ত্রবুদ্ধিবিচার, তা'র নৈতিক চিন্তাধারা,—তা'র যা কিছু সমস্ত কেন এমন ক'রে নষ্ট হয়ে গেল?

কার্জন পার্কের একটা বাবলাগাছের তলায় দুপুর বেলায় দাঁড়িয়ে সুনন্দার গলার ভিতর দিয়ে সহসা হাউ হাউ ক'রে কান্না উঠে এলো। কিন্তু চারিদিকের অগণ্য কৌতূহলী দৃষ্টির আক্রমণে নিজেকে সংযত ক'রে সে অগ্রসর হয়ে চললো।

পনেরোটি দিন ধ'রে সে মহানগরের ভিতর বাহিরে ঘুরে বেড়ালো

প্রেতিনীর মতো। আশা নেই, আশ্বাস নেই, সম্ভাবনা কিছু নেই। দুটি পাণ্ডুর নাস্তিক চোখ নিয়ে সে দেখে বেড়ালো সব! প্রাণের ভিতরকার গ্লানি যেন বাইরে এসে তা'র মুখে চোখে সর্বশরীরে কলঙ্কের কালি বুলিয়ে দিয়েছে। মনে হোলো, তা'র অবসাদগ্রস্ত হতাশার দিকে তাকিয়ে পথের লোক কৌতুক হাতছানিতে তা'কে ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি তা'র সেই পরিচিত চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকলো।

একান্তে বসলো সে। একান্তে—নিজের সঙ্গে নিজে। যদি এখানে সে আশ্রয় পায়, সে বাঁচে। যদি কেউ আর এখান থেকে যেতে না বলে, সে এক পাও নড়বে না। পেয়ালার পর পেয়ালা সে খাবে—যতক্ষণ তার সময় কাটে। সৌরীন এখানে ব'সে সেদিন সিগারেট খেয়েছিল, সেই গন্ধটা এখানে যেন আজও ঘুরছে। সুনন্দার গলাটা শুকিয়ে উঠলো। সহসা অন্যদিকে তা'র চোখ ঘুরলো। ও পাশের টেবলে এক কৃষ্ণকায় নিগ্রো ব'সে এতক্ষণ তা'র দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। নিগ্রো এবার হাসলো; অন্ধকার আফ্রিকা যেন নরখাদক পশুর মতো হেসে তাকে ইঙ্গিতে ডাকছে। যুদ্ধের মতো বিভৎস লোভাতুর তা'র মুখ—এ-যুগের পাশবিকতায় সেটা যেন লালাসিক্ত।

সুনন্দা একটা টাকা বা'র ক'রে দিল, তারপর ছিটকে পথে বেরিয়ে যেন জনসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করলো।

এই যে, সুনন্দা দেবী? হোটেলে কতক্ষণ?

সুনন্দা মুখ ফিরিয়ে দেখলো সৌরীনের পাশে কল্যাণী। কল্যাণী এগিয়ে এসে বললে, তোমার খবরটা পেয়ে আমি ভারি দুঃখিত হয়েছি, সুনন্দা।

সুনন্দা বললে, সত্যি নাকি?

সৌরীন বললে, আপনি একা নন্ সুনন্দা দেবী—

আপনি! সুনন্দা চমকে উঠলো সৌরীনের ভাষায়। সৌরীনের মুখে সে আপনি হয়ে উঠেছে! কল্যাণীর সামনে ঘনিষ্টতাটাকে সে চাপা রাখতে চায়। এরাই পুরুষ এরাই যুদ্ধ আনে, বিশ্বাস ভাঙে মনুষ্যত্বকে হতমানিত করে।

সৌরীন বললে, হ্যাঁ, আপনি কিছু একা নন। আমি, কল্যাণী রামশ্যাম—সকলের চাকরিই অনিশ্চিত।

সুনন্দা হেসে বললে, তাই নাকি? তবে নিশ্চিত কোন্‌টা?

কল্যাণী অপাঙ্গে তাকালো সৌরীনের দিকে এবং সৌরীন তার সঙ্গে মধুর হাসি বিনিময় করলো। কল্যাণীর হাতে ছিল একতোড়া ফুল, সেটা সে সুনন্দার অবশ হাতখানায় একপ্রকার গছিয়ে দিল। সৌরীন বললে, সুনন্দা দেবী, আপনি ত জানেন এ-যুগে কোনটাই নিশ্চিত নয়, স্থায়ী নয়, কোনটাই বিশ্বাস্য নয়—। তবে—

কল্যাণী তাকে শাসন করে বললে, আঃ কী হচ্ছে? তুমি ভারি ধোঁয়াটে!

সৌরীন হেসে বললে, সুনন্দা দেবী, একটি সুখবর দিই আপনাকে। আসছে আঠারোই তারিখে কল্যাণীর সঙ্গে আমার—

সুনন্দা সটান তাকালো সৌরীনের দিকে। সৌরীন সলজ্জভাবে বললে, আপনি সেদিন আসবেন, শুভেচ্ছা জানাবেন, এই অনুরোধ।

গলাটা এবার পরিষ্কার করে উদ্ধতভাবে সুনন্দা দুজনের মাঝখানে দাঁড়ালো। হেসে বললে, তুমি ঠিক বলেছ সৌরীন, এ-যুগে কোনটাই স্থায়ী নয়, বিশ্বাস্য নয়—এমন কি বিয়ের বন্ধনটাও বিদ্রূপ। যাকগে, শুভেচ্ছা জানানো না—তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট,—তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি। তোমাদের জীবন নিরাপদ হোক।

স্তম্ভিত দুখানা মূঢ় মুখের উপর দিয়ে সুনন্দা গর্বিতভাবে চলে গেল।

নগরের কাক-চিলেরা বাসায় ফিরেছে। সন্ধ্যার পর ঘুরতে ঘুরতে সুনন্দা বাড়ির কাছাকাছি এসে ভাবছিল, এত তাড়াতাড়ি সে ফিরবে কি না। এমন সময় পিছন থেকে এসে সন্তোষ বললে, এ কি রে, পথ হারালি নাকি ?

অশ্রুমুখী সুনন্দা দাদার দিকে ফিরে তাকালো। তারপর বললে, দাদা, আমার চাকরি আর নেই।

নেই ? —দাদা হাসিমুখে বললে, যাক, বাঁচিয়েছিস। এ-যুদ্ধের সব চেয়ে ভালো খবর এইটে।

দাদা—

বুঝেছি। চল ফিরে চল—এই বলে সন্তোষ ছোট বোনের গলা জড়িয়ে ধরে বাড়ির ভিতর নিয়ে চললো।

ডলু বললে, কিন্তু বাবা, এখনো যে মাস কাবার হয়নি—টাকা কোথা ?

ওই নাও, আবার টাকা ! পালাতে কি টাকা লাগে ? আগে চ'লে যাই, তারপর টাকার কথা ভাববো।—

সকালে উঠে দেখা যায়, পথ দিয়ে পলায়মান জনস্রোত। কেউ দাঁড়ায়না, পিছু তাকায় না, বিবেচনা করেনা—ছুটে চলেছে এদিকে ওদিকে। দিনের আলোয় সব সেরে নিতে হবে, অবেলার আগে সমস্ত ছুটোছুটি সারা চাই,—কেননা সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে থাকলেই কেমন যেন আতঙ্ক দেখা দেয়। পথঘাট জনহীন, যানবাহন চলেনা, দোকান বাজার নেই,—সমস্তটাই অরাজকতা।

ঠিক মনে পড়ছেনা, তবে অবিনাশ সেই বিশেষ তারিখটি তাঁর খাতায় টুকে রেখেছিলেন। সেটা সম্ভবত মঙ্গলবার রাত্রি। মনে হচ্ছিল জাপানী বিমানবাহিনী আকাশ থেকে অবিনাশের বাসাটা নিরীক্ষণ ক'রে আগে চ'লে গিয়েছিল। মঙ্গলবার রাত্রে জাপবিমান থেকে বোমা পড়লো হাতিবাগানের মোড়ে। অবিনাশের খুব কাছে, কেননা তাঁর বাসাটা ন'ড়ে উঠলো। তারপর সব চুপ। কেবল এ-আর-পির হুইসল্, আর কেমন একটা চাপা গোলমাল—এর বেশী কিছু না।

ভোর রাত্রের দিকে উঠে দু'তিনটি পুঁটলি সহকারে অবিনাশ ডলু আর নীলিমার হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়লেন। হাবড়া পেরিয়ে সোজা বর্ধমানের রাস্তায়। নীলিমা সঙ্গে থাকায় অনেকপ্রকার বিপদ গেছে, রায়গোষ্ঠির ইজ্জত বিপন্ন হয়েছে, লোভ ও কুটিল চক্রান্তের ফাঁদে পা দিতেও হয়েছে, তবু অবিনাশ ফিরে তাকান নি। পথে পথে দিন কাটিয়ে উপবাস ক'রে রোগে ভুগে হায়রাণ হয়ে তাঁরা প্রাণরক্ষা করেছেন। আত্মসম্মান গেছে, কিন্তু আত্মরক্ষা হয়েছে,—এই লাভ।

দুমাস পরে অবিনাশের চোখ ফুটলো। ডলুকে ধরবার জন্য পুলিশ লেগেছে, কেননা সে ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে এসেছে। অবিনাশও পালিয়ে এসে সাধুতার পরিচয় দেননি। তবে হোমিওপ্যাথীর বাক্সটা তাঁর সঙ্গে ছিল,—কোনোমতে অনাহারে মরা থেকে তারা তিনজন রক্ষা পেয়েছে এইমাত্র। কিন্তু এবার কলকাতায় গিয়ে অবিনাশ দাঁড়াবেন কোথায়? সেই বাসাটা আছে হয়ত, কিন্তু পুলিশের নজর কি নেই? মাসখানেক আরো অবিনাশ নানা কথা ভাবলেন। সামনে আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়া—খাদ্যের সুব্যবস্থা নেই। সুতরাং অবিনাশ কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন—কলকাতা ছেড়ে থাকবেনই বা কোথায়? অতএব আবার নীলিমা ও ডলুর হাত ধ'রে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। কিন্তু এবার তাঁর শরীর ভেঙেছে। হাতীবাগানের সেই পুরনো বাসাটায় ফিরে তিনি বিছানা নিলেন। একে হাঁপানী, তায় অনাহার—এবার হয়ত তিনি শেষ বিছানা পাতলেন। আর তাঁর শক্তি নেই।

অনেক উমেদারির পর ডলুর একটা কাজ জুটে গেল কাশীপুরের দিকে কোন্ কারখানায়। এখানে সে ছদ্মনামে ঢুকলো পুলিশের ভয়ে। আগে ছিল অনিল রায়, এখন হোলো পুলিন রায়। পুলিন ব'লে কারখানায় যদি কেউ ডাকে,—সে অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, সহসা মুখে জবাব আসে না। তারপরেই শশব্যস্ত জবাব দিয়ে এগিয়ে যায়। ডলু ভোর ছ'টায় বেরোয়, আবার আসে সন্ধ্যা ছটার পর। সুবিধা এই, অল্প দামে চাল ডাল পায়। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পায় বিনামূল্যে। ডলু আজকাল একটু একটু নেশাভাঙ করতে শিখেছে। কারখানার খাটুনি প্রাণান্তকর, একটু আধটু নেশা না করলে যেন গায়ের ব্যথা মরেনা। যারা নেশা করেনা, তা'রা এযুগে এমন কীই বা

ইদানীং

তিরিশ বছর আগে অবিনাশবাবু নাকি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। বাঙালীপল্টন দলে ভিড়ে তিনি গিয়েছিলেন মেসোপোটেমিয়ায়,—দুবছর পরে যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁর একটি চোখ নেই। কেউ বলে, উনি তুর্কী ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন; পিসিমা বলেন, চোখে ওঁর গুলির ছিটে এসে লাগে। অবিনাশবাবু নিজে কোনো কথা প্রকাশ করেননি, তবে তাঁর ওই কানা চোখটির সাহায্যে তিনি একটি চাকরি জোগাড় করেছিলেন। চাকরি পেলেন তিনি এখানকার এক জার্মাণ সদাগরি আপিসে। তখন বিশ্বশান্তি স্থাপিত হয়েছে। বেতন মাসে পঁচাত্তর টাকা,—বিপত্নীক অবিনাশের পক্ষে ওই অঙ্কটা কম নয়।

তারপর একটি চোখ নিয়েই তিনি সেকালে মালা-বদল করেছিলেন। সরোজিনী ঘরে ঢুকলেন, এবং বছর দশেকের মধ্যে দুটি মাত্র ছেলেমেয়ে রেখে তিনি টাইফয়েডে মারা গেলেন। অবিনাশ আর বিবাহ করেন নি। সেই ছেলেমেয়ে দুটি সাবালক। সংসারে অবিনাশের বিধবা বোন, এবং পুরনো চাকর হারু। অবিনাশের মাসিক পঁচাত্তর টাকাটা প্রায় একশো টাকায় এসে দাঁড়িয়েছিল এই সে-বছর।

তারপরে আবার এই যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে যখন

শত্রুপক্ষের নাগরিকদের বন্দী করা হচ্ছিল, সেই সময় অবিনাশবাবুদের জার্মাণ আপিসটি আবার অবরুদ্ধ করা হয়, এবং অবিনাশের চাকরি যায়! পঞ্চাশ বছর বয়সে একটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের চাকরি যাওয়াটা বড়ই দুঃখের কারণ, কিন্তু কোনো উপায় নেই। এবারেও অবিনাশ তাঁর সেই পঁচিশ বছর আগেকার সার্টিফিকেট, সুপারিশপত্র ইত্যাদি নিয়ে সরকারি মহলে অনেক হাঁটাহাঁটি করলেন, এবং তাঁর একমাত্র সম্বল কানা চোখটিকে দেখিয়ে অনেক প্রকার উমেদারি ও তদ্বির-তদারক চালালেন,—কিন্তু এ-যুদ্ধ আগেকার যুদ্ধ নয়। অবিনাশের কোথাও চাকরি হোলো না। এদিকে পেন্‌সন্ নেই, প্রভিডেন্ট ফণ্ড নেই, জমাজমি কোথাও নেই,—অবিনাশ একেবারে পথে দাঁড়ালেন। তাঁর নিরীহ এবং ভীরু চেহারাটা দেখলে এখন মনেই হয়না যে, তিনি কোনোকালে যুদ্ধে গিয়েছিলেন অথবা তাঁর শরীরে কখনও স্বাস্থ্যশক্তি ছিল। তিনি ধীরে হাঁটেন, ফুটপাথ দিয়ে হাঁটেন, ভিড় বাঁচিয়ে হাঁটেন—এবং এতই শান্তিপ্রিয় তিনি যে, মশামাছিও মারবার চেষ্টা করেন না। কিন্তু সেকথা থাক্। হঠাৎ এবারের দারিদ্র্যটা যেন তাঁর গলা টিপে ধরলো। তিনি বইপত্র নাড়াচাড়া ক'রে হোমিওপ্যাথী চর্চা করতেন—সেটা এখন একটু আধটু কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া তিনি ভাবলেন, বিশ পঞ্চাশ টাকা ধার ক'রে যদি ছোটখাটো একটা দোকান ফেঁদে বসা যায়।

তাঁর চাকরি যাওয়ার জন্য তাঁর ছেলে ডলু ম্যাট্রিক দিতে পারলোনা এবং মেয়েটারও কোনোমতে একটা বিয়ের জোগাড় করা গেলনা। এদিকে কাপড়ের দাম বাড়লো, চা'লের দাম চড়লো, অন্যান্য সামগ্রীও তাই। পিসিমা একবেলা ভাতে ভাত খান, হারু বুড়ো হয়েছে—আজকাল মাইনের বদলে একমুঠো খেতে পেলেই খুশী, নীলিমার

কোনো উৎপাত নেই,—কেবল মুস্কিল হয়েছে ওই ছেলেটাকে নিয়ে। ডলু বলে, আমি যুদ্ধে যাবো।

যুদ্ধে?—অবিনাশ দাঁত খিচিয়ে বলেন, এঃ বীরপুরুষ···মহাবীর। তোর বাপের কালে ছিল টাকায় ছ'সের খাঁটি দুধ—তাই গিয়েছিলুম যুদ্ধে! আর তুই ব্যাটা চিংড়িমাছের ঝোল খেয়ে মানুষ···যুদ্ধে নিয়ে যাবে তোকে কোন্ গুণে? ঝাড়ুদারের কাজই কি পারবি? যুদ্ধে অমনি গেলেই হোলো। এই ছাখ আমার চোখখানা···তুর্কীরা এসে বেয়নেট্ ঢুকিয়ে দিয়েছিল—তা জানিস? তুই ত' আলপিনের খোঁচায় অক্কা পাবি।

বাপের মুখের দিকে ডলু তাকিয়ে থাকে, তারপর এক সময়ে বলে, তবে একটা কিছু করতে হবে ত?

হবেই ত, তাই বলে যুদ্ধের কথা কেন? বিস্কুট খেয়ে দশদিন কাটাতে পারবি, জল না পেয়ে আট দিন?—বলতে বলতে অবিনাশ ঘরে গিয়ে ঢোকেন। ডলু মাথা হেঁট ক'রে চ'লে যায়।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় দু'চার আনা আট আনার বেশী কোনোদিন আসেনা, সুতরাং অনেক চেষ্টার পর অবিনাশ হাতী-বাগানের কাছাকাছি এক মুড়ি-মুড়কির দোকান দিয়ে ডলুকে নিয়ে বসলেন। খরচখরচা বাদ দিয়ে দৈনিক একটাকা দেড়টাকার বেশী হয়না। ঘরভাড়া চার টাকা, বাসাভাড়া বারোটাকা,—সুতরাং অভাব অনটনের চেহারাটা বড় করুণ। চারিদিকে চেয়ে অবিনাশ কূলকিনারা পান না। নীলিমার বিয়ের কল্পনাটা শিকেয় তোলা রইলো। মেয়েটার বয়স বছর পনেরো হোলো বৈ কি। ডলুর বয়স আঠারো।

মুড়ি-মুড়কির দোকানটা প্রায় বছর দুই চলবার পর হঠাৎ জাপানের আক্রমণ আরম্ভ হোলো। প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে তারা

পার্ল-হারবারে প্রবল আক্রমণ করলো; আবার এদিকে এসে শ্যাম ও ইন্দোচীনকে বাগ মানিয়ে মালয়কে কেটে দু'খানা করলো। বৃটেন, আমেরিকা, চীন—সবাই জাপানীদের হাতে নাস্তানাবুদ। ফলে, কী আতঙ্ক বাঙলা দেশে। সিঙ্গাপুর গেল, বার্ম্মা গেল গেল। সুতরাং কলকাতা থেকে লোকজন সবাই দিগ্‌বিদিক ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে। পৈতৃক প্রাণ আগে বাঁচুক।

অবিনাশের মুড়ি-মুড়কির দোকান বন্ধ হয়ে গেল। পিসিমা চেঁচামেচি করে কান্না ধরলেন—সুতরাং একদিন ছেলেমেয়ে-দুটোকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশ ও তাঁর বিধবা সহোদরা কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে পাড়ি দিলেন, আর তাঁদের খোঁজখবর পাওয়া গেল না। হারুও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিল।

আত্মরক্ষার অন্ধ বাসনায় পিসিমা যে-গ্রামে গিয়ে উঠেছিলেন, সেটা তাঁর চল্লিশ বছর আগেকার শ্বশুরবাড়ী। সেখানে আপন বলতে তাঁর কেউ ছিলনা বটে, তবে রক্ত-আমাশয় ব্যাধিটা সেই ভগ্ন অট্টালিকার সংলগ্ন এক শ্যাওলাধরা ডোবায় বোধ করি ওৎ পেতে লুকিয়ে ছিল। পরিচিত লোক পেয়ে পিসিমাকেই সেটা ধরলো, এবং মাস ছয়েক পরে অবিনাশ যখন ফিরলেন, তখন কলকাতায় জাপান অথবা তাঁর মুড়ি-মুড়কির সেই দোকান—কোনো-টারই কোনো চিহ্ন নেই। অবিনাশ অবশ্য বাড়ীওয়ালার পায়ে ধ'রে তাঁর সেই পুরনো হাতীবাগানের বাসাটা কোনোমতে দখল করতে পারলেন, এবং বাড়ীওয়ালার কাছে লেখাপড়া ক'রে প্রতিজ্ঞা করলেন, এর পর তাঁর অপর একটি চোখে জাপানী বেয়নেটের খোঁচা না লাগা পর্যন্ত তিনি আর এবাসাটি ছাড়বেন না। মাঝথেকে কেবল দাঁড়ালো এই, পিসিমা মারা গেলেন পীতাতঙ্কে! নীলিমার বয়স তখন প্রায়

সতেরো, আর ডলুর কুড়ি। অবিনাশের বয়সের আর হিসেব রইলোনা,—তাঁর জরাগ্রস্ত দেহযষ্টিখানা পঞ্চান্ন কিম্বা পঁচাশী বছরের পুরনো তা বলা কঠিন। শুকনো বোঁটায় ঝুলছে শুঁট্‌কো পাকা ফল—রস নেই, রং নেই—কখন উড়ো হাওয়ায় টুপ ক'রে খ'সে পড়ে কে জানে। তাঁর কঙ্কালখানার ওপর দিয়ে যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলছে। অবিনাশ আরো ক্লান্তিবোধ করলেন হারুর মৃত্যুতে। হারু একদিন হঠাৎ মারা গেল কলেরায়।

জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, সুতরাং দেশময় কল কারখানা গ'ড়ে উঠছে দিনের পর দিন। কাজকর্ম এখন পাওয়া সহজ। অনেক-দিনের অনাবৃষ্টির পর হঠাৎ এসেছে বান। কাগজের টাকা সস্তা হচ্ছে। চোরাবাজার দাঁড়িয়ে উঠছে, শৃগালেরা আনাগোনা করছে সুড়ঙ্গপথে। এমন সময়ে এক লোহার কারখানায় অবিনাশের এক কাজ জুটে গেল। তিনি খাতায় হাজিরা লিখবেন, কর্মীদের তদারক করবেন। মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। ডলুর কাজ জুটে গেল ট্রাম কোম্পানীতে—সে কনডাক্‌টারি করবে। মাসে তিরিশ। আর নীলিমাই বাকী থাকে কেন? সতেরো বছরের অল্পশিক্ষিত মেয়েটি একদিন সহসা কাজ পেয়ে গেল এক গেঞ্জির কারখানায়। সেখানে চার পাঁচটি সধবা ও বিধবা স্ত্রীলোক কাজ করে। তাদের সঙ্গে নীলিমা। তারা নীলিমাকে নিরাপদে রাখতে পারবে—এমন একটা প্রতিশ্রুতি অবিনাশ পেয়েছেন। পঁচিশ টাকা মাইনে' নীলিমার,—কাজ শিখলে আর কিছু।

এবার আর কোনো ভাবনা নেই। বাড়ীওয়ালার বিশেষ অনুরোধে অবিনাশ তিনটাকা বেশী ভাড়া দিতে রাজী হলেন। চাউলের মণ তখন আট টাকা, কাপড় প্রায় ছয় টাকা তা হোক, এবার তিনি

ঈশ্বরের ইচ্ছেয় বিপদ উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবার হালটা বাগিয়ে ধ'রে থাকলে দাড় বেয়ে চলে যাওয়া সহজ। নদীতে ঢেউ আছে, আকাশের কোণায় আছে কালো মেঘের ভ্রূকুটি, ঝড়ের একটা আসন্ন আভাস,—তা হোক, হালটা ভালো ক'রে ধ'রে রাখা চাই। তিনি বিগত যুদ্ধের সেই মেসোপোটেমিয়ার ফেরৎ,—তাঁর সাহস হারালে চলবেনা।

সেই পুরনো একশো টাকা আবার ফিরে এলো, কিন্তু আগেকার একশো টাকার সেই সচ্ছলতা নেই, এই যা দুঃখ। তবে মুড়ি-মুড়কির দোকানের সেই হীনবৃত্তি নয়, অবিনাশের পক্ষে এই সান্ত্বনা। কিন্তু একটা কথা। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার অনেক নীচে নেমে এসেছে এটা চোখে লাগে বৈকি। বোয়ালীর বিখ্যাত রায় গোষ্ঠি তাঁরা,—তাঁদের সেই ভদ্রাসনের মধ্যে একসঙ্গে পাঁচহাজার লোক পাত পেড়ে বসতে পারতো; এবং অবিনাশের বাবাও রূপার গড়গড়ায় তামাক খেয়ে গেছেন। রায় উপাধি তাঁদের চলছে সেই নবাবী আমল থেকে। তাঁদেরই তৃতীয় পুরুষ অবিনাশকে এসে দাঁড়াতে হোলো বেলেঘাটার এক লোহার কারখানায়, এটা অত্যন্ত বেদনার কথা। রায়গোষ্ঠির মেয়েকে গিয়ে কাজ নিতে হোলো গেঞ্জির কারখানায়,—এমন কথা কেউ ভেবেছিল কি দশবছর আগে? ছেলেটা হোলো ট্রামের কনডাক্টর—অথচ সে সহজেই হতে পারতো জেলার হাকিম।

খাতায় হাজিরা লিখতে লিখতে অবিনাশ এই সকল কথা ভাবেন। তিনি যখন মেসোপোটেমিয়া থেকে ফিরে এলেন, তাঁকে নিয়ে পথে পথে কী শোভাযাত্রা আর সমারোহ। গোলদিঘীর ওখানে গাড়ী ঘোড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লাটসাহেব থেকে সর্বপ্রধান কর্মচারী

এবং হাইকোর্টের জজেরা অবিনাশের করমর্দন করেছিলেন। গ্রাণ্ড হোটেলে খাওয়া, মেমসাহেবের নাচ, মদের বোতল ওড়ানো, মোটর থেকে মোটরে লোফালুফি, সে একটা দিন! অবিনাশকে অভ্যর্থনা করা হোলো,—হে বাংলার বীর, হে দিগ্বিজয়ী সুসন্তান, হে নির্ভীক, হে অগ্নিহোত্রী,—সে সব কত বড় বড় কথা! খবরের কাগজে বড় বড় হরপে অবিনাশের নাম ছাপা, প্রবন্ধ লিখে জয়গাথা!

অবিনাশ হাসিমুখে একটি বিড়ি ধরিয়ে কারখানার মজুরদের পাশে পাশে গিয়ে তাদের কাজকর্ম তদারক করেন। হ্যাঁ সেই একদিন!

ইতিমধ্যে কলকাতায় কয়েকবার সাইরেন বেজেছে, অনেকে রাস্তার গর্তে লুকিয়েছে, অনেকে নিজের নিজের কান ধ'রে উপুড় হয়ে শুয়েছে, অনেকে কারখানার গুমটির মধ্যে ঢুকে নানাপ্রকার অসৎ কার্য করেছে। মাঝখানে সে ত' অনেক কথা। পুলিশের গুলিতে কত লোক মরেছে, কত ট্রামগাড়ি জলেছে, কত ইলেকট্রিক আর টেলিফোনের তার কাটা গেছে। অবিনাশ জানেন, ইংরেজের ক্ষয় নেই, লয় নেই—ওরা শ্মশানে গিয়েও বেঁচে উঠে আসে। ওরা সব যুদ্ধেই হারে কিন্তু শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করে। অবিনাশ অনেক দেখেছেন, এবার আর বিশ্বাস হারাবেন না।

দ্রুত, উন্মত্ত, অশ্রান্ত যুদ্ধের আয়োজন চলেছে। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ধ'রে কল-কারখানায় লোহার জিনিষপত্র তৈরী হচ্ছে। অবিনাশ মাঝে মাঝে রাত জেগে কাজ করেন, মাসকাবারে উপরি পান, মাঝে মাঝে জলখাবারও। নীলিমা আনে পঁচিশ টাকা, ডলু তিরিশ। এবার তাদের আয় মাসে একশো ছাড়িয়ে গেছে। নীলিমা এখন একাই পথেঘাটে আনাগোনা করে। ডলু বিড়ি টানতে শিখেছে, এবং অবিনাশ একটু ভোজনবিলাসী হয়ে উঠেছেন।

হঠাৎ সমস্ত চেহারাটা গেল উল্টে। একদিন সন্ধ্যারাত্রে সাইরেন বাজলো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে—যা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি,—কলকাতার প্রান্তে বোমাবর্ষণ আরম্ভ হোলো। শীতের রাত্রে সেই অদ্ভুত মেঘগর্জনের শব্দ। নিস্তব্ধ আর্ত শীতকম্পিত অন্ধ রাতে কলকাতার আতঙ্কিত অধিবাসীরা ঘরে ঘরে অন্ধকারে মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলো।

সকালের আলোয় সকলে উঠে জানলো তাহ'লে বোমাবর্ষণের পরেও বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু এতদিন পরে এবার তবে সত্যই কলকাতার পালা এসেছে,—এই মনে ক'রে আবার সবাই পালাতে লাগলো। পরের দিন রাত্রে পুনরায় জাপানী বোমাবর্ষণ—সুতরাং আর কোনো প্রকারেই স্থির থাকা যায় না। অবিনাশ ছুটতে ছুটতে সেদিন বাড়ী এলেন। তাঁর শরীর দুর্বল, হাঁটু দুটো কাঁপছে, গলা শুকিয়ে উঠেছে,—এ বাসায় একদণ্ড থাকতেও আর সাহস নেই তাঁর। বিকাল চারটেয় নীলিমা ফিরে আসে, সন্ধ্যা সাতটার পর ফিরে আসে ডলু। এই দুটি মাতৃহীন ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি কোন্ পথে পাড়ি দেবেন, তাই ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। ডলু ট্রাম কোম্পানীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বিপদ যেমনই হোক—সে কাজ ছেড়ে পালাবেনা! অবিনাশের প্রতিশ্রুতিও তাই। কিন্তু এসব অবান্তর। আগে প্রাণ, পরে চাকরি।

ডলু বললে, পালিয়ে গেলে ওরা যে জেলে দেবে বাবা!

অবিনাশ বললেন, এঃ জেল খাটবি তা হয়েছে কি? আগে পালিয়ে বাঁচি, জেল্ যখন হবে তখন হবে। কাল যেমন ক'রেই হোক আমরা পালাবো। হাতে এক একটা পুঁটুলি—বাস, ঘরে তালা দিয়ে দুর্গা দুর্গা—

সুখে আছে? তাছাড়া ডলু বোতলের জিনিসটাই খায়, ছোটলোকদের মতন তাড়ির ভাঁড় মুখে ঠেকায় না। ডলুর একটা আত্মসম্মান আছে।

কিন্তু অভাবের ঘরকন্না চলেনা। চাউল অনেক দাম, কয়লা আগুন, কাপড় দুর্মূল্য। একা ডলুর রোজগারে অসম্ভব। অবিনাশের ঔষধ পথ্য আছে, তাছাড়া নীলিমা,—ঘরভাড়া। সেদিন পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক অবিনাশকে দেখতে এলেন; এবং প্রশ্ন করলেন, আপনার ওই মেয়েটিকে কোনো কাজে লাগান না কেন? আজকাল কাজের কি অভাব?

হাঁপানীর টান চেপে অবিনাশ বললেন, আপনি সাহায্য করবেন কি? দেখছেন, ত, দুর্ভিক্ষ মড়কের দিনে......আমি আর পেরে উঠিনে।—বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এলো। পুনরায় ধরা গলায় বললেন, বোয়ালীর দিগম্বর রায়ের বংশ আমরা......দেখুন কি অবস্থা, —ছেলেটা কারখানার মজুর, মেয়েটার পরণের কাপড় নেই...আমার কবরেজের বড়ি জোটে না! কোথায় যাবো...কি করবো।...

ভদ্রলোকটি যাবার সময় ব'লে গেলেন, আচ্ছা, আমাকে একটু খোঁজ করতে দিন...দেখি যদি কিছু পারি।

তিনি বেরিয়ে যাবার পর নীলিমা এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, এবার বুঝি শুয়ে-শুয়ে লোকের কাছে ভিক্ষে চাও?

অবিনাশ বললেন, লোকের দয়া নিলুম এতদিন, এবার ভিক্ষা নিবিনে কেন মা?

নীলিমা বললে, তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো, আমি নিজে একটা কাজ খুঁজে নেবো।

কোথায় পাবি?

যেখানেই হোক, পেয়ে যাবো।

কিন্তু দিন আষ্টেক পরে পাড়ার ওই ভদ্রলোকটিই একদিন জানালেন, দেশী মিলিটারী হাসপাতালে নার্সের কাজ খালি আছে। অবিশ্যি আগে আপনার মেয়েকে কয়েকদিন শিক্ষানবিশি করতে হবে।

অবিনাশ বললেন, কিছু কিছু পাবে ত?

হ্যাঁ, তা পাবে। মাসে টাকা চল্লিশেক। তবে রাত্রে মাঝে মাঝে সেখানে থাকতে হবে।

বন্দোবস্ত ভালো ত?

লোকটি বললে, হাঁ, তা ভালো। তবে ওই পরিশ্রমের কাজ।

নীলিমা নার্সের কাজ নিয়ে গেল মিলিটারী হাসপাতালে; কিন্তু মাসখানেক পরে চল্লিশটি টাকা এনে বাপের হাতে দিয়ে বললে, বাবা আমি অন্য চাকরি জোগাড় করেছি।

অবিনাশ বললেন, কেন মা?

আর কিছু জানতে চেয়ো না, ওখানে আমার চলবে না।

অবিনাশ চুপ ক'রে গেলেন। নীলিমা বললে, বাবা আমি কাজ পেয়েছি এক খাকি পোষাকের কারখানায়। সেখানে মেয়েরাও আছে, তারা জামায় বোতাম বসায়, কাটিংয়ের কাজ করে, টুপির কাপড় শেলাই করে। সেই কাজই আমার ভালো।

অবিনাশ বলেন, কত দেবে?

পঞ্চাশ টাকা।

অবিনাশ চুপ ক'রে গেলেন। পঞ্চাশ টাকার দাম তখন পঁচিশ টাকার বেশী নয়, কারণ চারিদিকে তখন প্রবল দুর্ভিক্ষের সমারোহ। জিনিষপত্র যা কিছু অগ্নিমূল্য।

তবু এই ছোট পরিবারটি দুদিনের ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েও কোনো-

প্রকারে টিঁকে রইলো। নীলিমা বাপের সেবা করে, দাদার জন্য রাঁধে, বাসন মাজে, তারপর সাজগোছ ক'রে সকাল ন'টায় বেরিয়ে পড়ে। আনাগোনার সুবিধার জন্য সে ট্রামের একখানা মাসিক টিকিট ক'রে নিয়েছে। রোজই একই রাস্তার মোড় থেকে সে গাড়ীতে ওঠে, সুতরাং অনেক কনডাক্টরের মুখ চেনা তার। নীলিমা ঘড়ির কাঁটা ধ'রে নিয়মিত চাকরি করে। এবারের যুদ্ধটা বেধেছিল ঠিক যেন নীলিমাকে মানুষ ক'রে তোলার জন্য। এতদিনে নীলিমা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

ডলু মাঝে মাঝে বাইরে থেকে খেয়ে আসে, মাঝে মাঝে আসে চোখ দুটো রাঙা ক'রে। নীলিমা জানে দাদা নেশা করে আসে, কিন্তু বাবার কানে খবরটা তু। আর সে অশান্তি বাড়াতে চায় না। অবিনাশ রাত্রের দিকে খোঁজেন, কোনোদিন ডলুকে ডাকেন, নীলিমা তখনই এসে বলে, দাদার খাটুনি বেড়েছে খুব, খেয়ে দেয়ে সে ঘু পড়েছে—তাকে আর ডেকোনা, বাবা।

একদিন সুবিধে পেয়ে ডলুকে সে বললে, দাদা? তোমার মতলবটা শুনি?

ডলু হাসিমুখে বললে, কেন রে?

নীলিমা বললে, পেটে এতদিন ভাত জোটেনি। এবার যদি বা একটু সুবিধে হোলো,—তুমি কি সকলের মুখ পোড়াতে চাও?

ডলু কতক্ষণ নীলিমার দিকে তাকিয়ে এক সময় বললে, যা যা বাজে বকিসনে। পুরুষ মানুষকে অত পাহারা দিতে নাই—যা।

ডলু চ'লে গেল। নীলিমা চোখের জল নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাস কাবার হ'লে ডলুর অনাচারটা যেন একটু বেড়ে ওঠে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নীলিমা দাদার জন্য জেগে বসে ছিল। শীতের রাত। রাস্তায় রাস্তায় সবহারার দল একমুঠো ভাতের জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। কেরোসিনের ডিবেটা সামনে রেখে নীলিমা তন্দ্রাজড়ানো চোখে জেগে ভিখারীদের আর্তকণ্ঠ শুনছিল। অবিনাশ ঘুমিয়ে ছিলেন, তবু তাঁর হাঁপানীর টান শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় পথের নীচে একটা অস্ফুট গোলমাল শুনে নীলিমা মুখ বাড়িয়ে বুঝতে পারলো, দাদা ফিরেছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা হবে। নীলিমা তাড়াতাড়ি নেমে এলো। একখানা রিক্সা থেকে ডলুর বন্ধু অনন্ত তখন ডলুকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। ডলু বিড়বিড় করে কী যেন বকছে। নীলিমা তাড়াতাড়ি ক'রে এসে দাদার হাত ধ'রে বাড়ীর মধ্যে টেনে আনলো। বললে, দাদা, তো[illegible]ার মান-সম্ভ্রমের ভয় নেই?

অনন্ত সেই অন্ধকারে নীলিমার দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে বললে, মাইনে হাতে পেলে তোমার দাদা একেবারে বেহেড্ হয়ে যায়। এই ছাখোনা, আদ্ধেক টাকা উ'ড়িয়ে দিয়ে এলো।

নীলিমা বললে, আপনি কোত্থেকে আনলেন দাদাকে?

কোত্থেকে?—অনন্ত বললে, সেটা ঠিক বলা চলেনা।

আমি দাদাকে শুইয়ে আসছি এখুনি।—ব'লে নীলি[illegible] ডলুকে টানতে টানতে নিয়ে ঘরে শুইয়ে দিয়ে এলো। ঘৃণায় আর গ্লানিতে যেন তা'র আকণ্ঠ ভ'রে উঠেছে।

রিক্সা ভাড়া কত তা নীলিমা জানেনা, তবু দুটো টাকা হাতে নিয়ে সে আবার নেমে এলো। অনন্ত তখন কি যেন একটা আশায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীলিমা এসে দাঁড়ালো। বললে, আপনি খুব উপকার করলেন আমাদের। রিক্সা ভাড়া কত?

অনন্ত একটু কাছে এগিয়ে এলো। হেসে বললে, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু ডলু যে মাইনের আদ্ধেক টাকা খুইয়ে এলো, তোমাদের চলবে কেমন ক'রে তাই ভাবছি।

নীলিমা বললে, আদ্ধেক টাকা গেছে, আধপেটা খেয়ে থাকবো!

অনন্ত নিজের মুঠো থেকে দশটাকার একখানা নোট বাড়িয়ে বললে, এটা নাও তুমি···সামান্য সাহায্য···

নীলিমার মাথার মধ্যে চন্ করে উঠলো। মধ্যরাত্রির অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে তা'র হাতে এই ছোকরা টাকা দেয় কেন? তবে কি কেবলমাত্র পরোপকারী সে নয়, আরো কিছু? নীলিমা সহসা সচকিত হয়ে বললে আপনার টাকা আমি নিতে যাবো কেন? আপনি বরং রিক্সা ভাড়ার দরুণ একটা টাকা নিয়ে যান। এই বলে একখানা একটাকার কাগজ ফেলে দিয়ে নীলিমা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ ক'রে ভিতরে চ'লে গেল।

অবিনাশ ভালো হ'য়ে আর উঠবেন না! ঔষধপত্র অনেক খরচ করলে তাঁর হাঁপানীর টান একটু কমে, কিন্তু একটু আলগা দিলেই সেটা আবার বেড়ে ওঠে। অল্প অল্প জ্বর হয়, মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট— তিনি প্রায়ই শয্যাশায়ী। কিন্তু অবিনাশের ধারণা, এটা সাময়িক। তিনি আবার ভালো হয়ে উঠবেন, শরীরে জোর পাবেন, এই যুদ্ধ একদিন থামবে, নীলিমার বিয়ে দেবেন, তারপর ডলুর বউ আনবেন, নাতিকে কোলে ক'রে মানুষ করবেন। অবিনাশ কল্পনা করেছেন, দুর্যোগটা ঠেলতে ঠেলতে একদিন যদি এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধটা থামে। যুদ্ধটা থামবামাত্রই তাঁর বর্তমান অবস্থা মন্ত্রবলে ফিরবে, এই ধারণা নিয়ে অবিনাশ আজও ধুক ধুক করছেন।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর মনে র'ড়ে পুরনো কথা। তাঁর দাদা ছিলেন ডেপুটি, মামা ছিলেন হাইকোর্টের উকীল। তাঁদের কলকাতার বড় বাড়ীতে বড় বড় মজলিস বসতো,—কত পণ্ডিত, কত গায়ক, কত মান্যগণ্য লোক যাতায়াত করতেন। তাঁর জেঠামশাই ভাটপাড়া থেকে ন্যায়রত্ন উপাধি পেয়েছিলেন। অবিনাশের মা ছিলেন, ধুচুনীর রাজবাড়ীর ছোটতরফের মেয়ে। আজও ধুচুনীর রাজবাড়ীর ভগ্নাংশ দাঁড়িয়ে রয়েছে হাবড়া ময়দানের ওপাশে।

অবিনাশ ভাবেন, এবার যুদ্ধ থামলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠে অন্ততঃ তাঁর পারিবারিক আভিজাত্যটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। নীলিমার বিয়েটা হওয়া চাই সম্ভ্রান্ত পরিবারে—বংশমর্যাদায় যারা সমান সমান। ডলুর বউ আসবে ঘরে টুকটুকে। ফুটফুটে নাতিকে কোলে নেবেন। বোবা দেওয়ালগুলির গায়ে তার অলীক স্বপ্নগুলি ছায়াছবি এঁকে মিলিয়ে যায়। তাঁর চোখে কেমন একটা পরিতৃপ্তির ঘুম আসে।

অবিনাশ বিছানাতেই থাকেন। তবে মাঝে মাঝে একটু উঠে ঘরটা ঝাড়া-মোছা করেন, হয়ত নীলিমার কাজে একটু সাহায্য হয়, হয়ত বিকালে উনুনটা ধরিয়ে কিছু একটা চড়িয়ে দেন, হয়ত অনেক কষ্টে দু'একখানা কাপড়-চোপড় কেচে রোদ্রে মেলে দেন। কিন্তু তারপরেই আবার তাঁকে বিছানা নিতে হয়। একদিন পরিশ্রমের জন্য তিনদিন ধরে ক্ষতিপূরণ করতে হয়।

বছরখানেক ধরে নীলিমা কম টাকা আনেনি। ডলুর মাইনেও বেড়েছে। ভাইবোনের উপার্জন মিলিয়ে প্রায় সওয়া একশো টাকা কিন্তু জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে উঠেছে কম পক্ষে ছয় গুণ। একখানা সাধারণ শাড়ী দশ টাকা, একখানা ধুতি আট টাকা। টাকার

পরিমাণটা গরীবের ঘরে শুনতে অনেক, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বর্তমান মূল্যটা হাস্যকর। এর ওপর আছে নীলিমার হাতখরচ, ডলুর বাজে খরচ। সুতরাং ঘরকন্নাটা চলে অতিকষ্টে। মাঝে মাঝে অবিনাশের ঔষধপত্র বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ীওয়ালা ইতিমধ্যে পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়েছে।

নীলিমা হয়ে উঠেছে তরুণী। বাস্তবিক তা'র জীবনটাও ত অনেকখানি পঙ্গু! তা'র আনন্দ কোথায়? একটুখানি পুষ্টিকর খাওয়া, একটুখানি পরিচ্ছন্ন হাওয়া, একটু আধটু স্বচ্ছন্দ গতিবিধি,—এ নৈলে তা'র চলবে কেন? নগরে আমোদ আছে, আনন্দ আছে, কৌতুক আর কৌতূহলের কত বিবিধ উপকরণ আছে,—সমস্তর থেকে মুখ ফিরিয়ে সেই-বা কেমন করে বাঁচবে? উপার্জন করে সে কম নয়, কিন্তু টাকায় তার অধিকার কোথায়? একটু এদিক ওদিক হলেই বাপের কাছে ধমক খায়, ভাইয়ের কাছে গঞ্জনা! তাকে সংসারটি চালাতে হবে, দুবেলা পাত পেড়ে ভাত দিতে হবে,—জামা-কাপড়ের নগদ দাম জমিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব পালন করার পর তার নিজের সমস্যাটা মাথা তুলে ওঠে। সেও মানুষ, তাকেও সুস্থ হয়ে বাঁচতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ গত বছর শীতের শেষে আবার নদী ম'রে গেল। তলার বুকে কাদা উঠলো। লগি ঠেলে নৌকা চালানো যায় না। ডলুর অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাকে ধরলো ব্যাধিতে। সেই ব্যাধির সঙ্গে কোনোকালেই এ পরিবারের পরিচয় ছিল না। খবর পেয়ে জানা গেল, যুদ্ধের কারখানায় মাইনে ছাড়াও ডলু কেমন ক'রে না জানি কাঁচা পয়সা পেত অনেক। সেই কাঁচা পয়সাটা নৈতিক পথ দিয়ে খরচ হোতো না।

প্রথম-প্রথম ডলু কাজ করতে যেত ভোরবেলায়, কিন্তু তারপরে ভোরবেলায় সে বিছানা ছাড়তে পারতো না। রাত্রিজাগরণ ও ব্যাধির ছায়াটা ছাপ রাখে তার মুখে চোখে। তার ক্লান্তি, তার মন্থরগতি, তার চেহারার বিকার—সমস্তটা লক্ষ্য করে নীলিমা আতঙ্কিত মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চ'লে যায়। ডলুর মুখে চোখে চাকা চাকা মাংসল ঘা ফুটে উঠেছে। নীলিমা এক এক সময়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, দাদা—?

ডলু ভাঙা গলায় জবাব দেয়, কেন?

নীলিমা আর্তকণ্ঠে বলে, জাপানীরা যে বলেছিল বোমা ফেলে সব শেষ ক'রে দেবো,—কই, তারা ত' এলো না?

ডলু মুখ বিকৃত করে চ'লে যায়। নীলিমা দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে দেয়। চোখ বেয়ে জল আসে।

পরবর্তী অবস্থাটায় ডলু যখন তখন পথে বেরিয়ে পড়ে, বোধ হয় ডাক্তারখানায় যায়,—সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যায় এসে ঘরে ঢোকে। একদিন অনন্ত তাকে খুঁজতে এসে নীলিমাকে জানালো ডলুর চাকুরি নেই।

নেই! চাকুরী নেই কী বলছেন? চালাবো কেমন ক'রে?

অনন্ত বললে, ওরা বলেছে ডলুর যা ছোঁয়াচে অসুখ—ওকে আর কাজে নেবেনা।

নীলিমা থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

স্ত্রীলোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য ফস্ ক'রে অনন্ত বললে, ভগবান যেমন ক'রেই হোক চালিয়ে দেবেন!

ভগবান!—একটা যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত অশ্রুতপূর্ব শব্দ নীলিমার কানের ভিতরে খোঁচা দিল। বারান্দা ছাড়িয়ে উপর দিকে সে চেয়ে দেখলো, একখানা এরোপ্লেন্ ছুটে চলেছে হিংস্র গর্জনে! নীলিমা

অনন্তর কোনো কথায় জবাব না দিয়ে চ'লে গেল। ভগবান স্পষ্ট নঃ কিন্তু দুঃসহ সংসারযাত্রার করাল বিভীষিকাটা অনেক বেশি স্পষ্ট।

অনন্ত রোজই আসে ডলুর কাছে। ডলুর অকৃত্রিম বন্ধু সে, অত্যন্ত সেবাপরায়ণ—তা'র আলাপ আচরণে মিষ্টতার বিন্দুমাত্র অভাব নেই। যাবার সময় ঔষধের কুলুঙ্গীর উপরে দুটি ক'রে টাকা রেখে যায়। অনন্ত জানে, টাকা অনেক বড়, ভালোবাসার চেয়েও বড়। সুতরাং মাঝে মাঝে সে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজের চেয়ে টাকার ওপর তার অনেক বেশী বিশ্বাস।

দিন কয়েক পরে ডাক্তার এসে অবিনাশকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, কি খাচ্ছেন এখন?

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নীলিমা বললে, কিছু না।

জ্বর কবে থেকে?—ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চন করে প্রশ্ন করলেন।

এই ক'দিন।

হুঁ,—আর বোধ হয় আমাকে আসতে হবে না।—ব'লে বিকৃত মুখে ডাক্তার টুপিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। নীলিমা হাতের মুঠো থেকে দুটো টাকা বার করে বললে, এই আপনার—

থাক।—ব'লে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

জার্মাণী হেরে যাবার অল্প কয়েকদিন পরে হঠাৎ রুগ্ন ডলু একদিন নীলিমাকে কাছে পেয়ে ডাকলো, হ্যারে!

নীলিমা ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, কেন?

যা শুনছি তা সত্যি?

কোনটা?

অনন্তর কাছে শুনলুম, তোর নাকি চাকরি গেছে?

চাকরি চিরদিন থাকেনা।—ব'লে নীলিমা বেরিয়ে গেল। তার অনেক কাজ। এবার থেকে ঘরে ব'সে থাকলে চলবেনা। এই সপ্তাহের মধ্যে তাকে একটি চাকুরি খুঁজে বার করতে হবে। জার্মানী হেরেছে, কিন্তু নিজের ভাগ্যের কাছে হার মানলে চলবেনা। খালি পোষাকে বোতাম বসাবার দরকার নেই, টুপি সেলাই স্থগিত রয়ে গেল,—কিন্তু ভাতের হাঁড়িটা শিকেয় তুলে রাখলে চলবে কেন! সবাই উল্লাস করছে এই যুদ্ধ জয়ে; তার চোখে জল লোকে শুনবে কেন? জাপান এখনো হারেনি, এই যা ভরসা। এখনো কোন কাজ মিলতে পারে, এখনও উপবাস রক্ষা হয়, এখনো নীলিমা সম্ভ্রম বাঁচাতে পারে! প্রত্যেকদিন যেন যুদ্ধ চলে, বোমা পড়ে, অরাজকতা থাকে, রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দেয়,—নৈলে নীলিমার বাঁচবার পথ কোথায়? কে তাকে টাকা দেবে? কে দেবে চা'ল আর কাপড়? কে দেবে তাকে চাকরির খবর? একটা চরম অধঃপতন থেকে বাঁচবার জন্য নীলিমা ছুটোছুটি করতে লাগলো।

লক্ষ লক্ষ লোক, লক্ষ লক্ষ কারবার—তাকে কেউ ডাকেনা কেন? সে লেখাপড়া শেখেনি, কী এসে গেল? যুদ্ধের কাজে লেখাপড়া কি দরকার? যুদ্ধের শেষে কেবল হাত দুটো, সুস্থ থাকলেই হোলো। নীলিমা আপিসে আপিসে গিয়ে দেখাশোনা করতে থাকে। তা'র দাঁড়িয়ে থাকাটা সপ্রতিভ, চোখ দুটো সলজ্জ, মুখে ভাষা নম্র, তা'র ভাবভঙ্গীতে চটুলতার অভাব,—মিলিটারী যুগে তার চাকরি হবে কেন?

ডলু সেদিন কোনোমতে শরীরটাকে সোজা ক'রে বললে, আমাকে দুটো টাকা দে'না রে?

নীলিমা বললে, টাকা কোথা?

কেন, ওই যে অনন্তর কাছে তুই দশটা টাকা নিলি?

তুমিও নাও ওর কাছে?

ডঃ হতভাগা তোকে টাকা দেবে, আমাকে দেবেনা।

নয়টা টাকা দাদার হাতে দিল! ডলু বেরিয়ে গেল সন্ধ্যার দিকে। ফিরে এসে ঘরে ঢুকলো টলতে টলতে। একথা সে জানে যার চাকরি থাক্ বা না থাক—নীলিমার হাতে টাকা থাক কেননা অনন্তর কাছে নীলিমা বেশ টাকা আদায় করতে জানে। চুপ করে শুয়ে রইলো পরম নিশ্চিন্তমনে। বোনটা বড় হয়েছে, আর তা'র ভাবনা নেই। সে যতদিনই অক্ষম থাক্ অথবা ব্যাধিকর্মণ্য থাক্—তার খাওয়ার ভাবনা আর ভাবতে হবেনা। ডলু আজকে মাদকসেবনের পর আগামী সাতদিন বিছানা থেকে তার ওঠা অসম্ভব; যন্ত্রনায় সে কুঁকড়ে কাৎরাতে থাকবে, কুৎসিত ব্যাধির অপমানে সে বিছানার ওপর মাথা ঠুকতে থাকবে,—কিন্তু ব'লে নেশা ছাড়বে সে কেমন করে?

জানে, আগামী কাল থেকে গলিত ক্ষত আবার ভীষণ চেহারায় তার সর্বাঙ্গে দেখা দেবে! তবু ডলু নীলিমার কথা মনে করে পরম নিশ্চিন্ত! নীলিমার চাকরী না থাকলেও উপার্জনটা থাকবে।

বিনাশের আর দেরী নেই। মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে ফেনা, পাঁজরের হাড়ের ভিতর থেকে হাপরের মতো একপ্রকার আওয়াজ বেরোচ্ছে। কোটরগত চোখ দুটো বন্ধ। সম্ভবত ঘোষালীর রায়গোষ্ঠীর প্রাচীন আভিজাত্য ফিরিয়ে আনার দিব্যসাধনায় তিনি বিভোর।

অবিনাশ আর কিছু খান না—এটা নীলিমার পক্ষে সুসংবাদ। ওষুধ পাত্র মুখে গলেনা, এর চেয়ে আনন্দ আর কী আছে? দাদা ওষুধ চায়না—নোংরা রুগ্ন হাতখানা দরজা দিয়ে বা'র ক'রে একমুঠো শুকনো ভাত শুধু চায়। কিন্তু নীলিমা চায় সব। ভাত, কাপড়,

বিপ্লব, বোমা, মহামারী—এগুলো তার দরকার। সমুদ্রটাকে আসুক, আগুন লাগুক পাড়ায় পাড়ায়, রক্ত গড়িয়ে যাক্ পথে। হোক না একটা প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় প্রলয়, চলুক না দেশব্যাপী অনাচার, না শত সহস্র মেয়ের সম্ভ্রম, মরুক লক্ষ লক্ষ অনাহারে,—কী এলো!

ট্রামে চ'ড়ে নীলিমা চলেছিল। জনতার ভিড়, মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি। নীলিমার বাঁকা চোখ ছিল একটি আনমনা ভদ্রলোকের জামার পকেটের দিকে। ঠিক—কোনো ভুল নেই, কোনো অন্যথা নেই। নীলিমা ঠিক পারবে, কিছুতেই সে অক্ষমতা প্রকাশ করবে না। ঠিক—ঠিক!

নীলিমা ট্রাম থেকে নামবে। ভিড় ঠেলে নিজেকে বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে—সে নামবে! সত্য সত্যই সে নেমে পড়লো এক মোড়ে। তা'র হাত পা শরীর চোখ—সমস্তটা অধীর উত্তেজনায় কাঁপছে। উল্লাসে কাঁপছে, ঘৃণায় কাঁপছে, বেদনায় কাঁপছে। সে আঁচলের তলা থেকে এক মূল্যবান মনিব্যাগ বা'র ক'রে খুলে দেখলো।

ব্যাগটিতে আছে মাত্র দশ আনা, আর একখানা কাগজ প্রেসক্রিপশন। সহসা নীলিমার উল্লাস নিবে গেল। কিন্তু এই ট্রামে ব্যর্থ হোলো বটে, পরের ট্রামখানায় তাকে সিদ্ধকাম হতেই হবে। মিনিট অপেক্ষা ক'রে দ্বিতীয় ট্রামখানায় সে উঠে পড়লো। এবার খুব ভিড়, এবং এবারেও প্রচুর সুবিধা। নীলিমা মরিয়া হয়ে উঠলো।

কন্‌ডাকটর এসে টিকেট চাইলো। নিত্যদিনের অভ্যাসের মত নীলিমা ঘাড় নেড়ে জানালো, তা'র মাসিক টিকিট আছে। কন্‌ডাকটর বললে, বা'র ক'রে দেখান্।

নীলিমা টিকিটের কোন্‌টা তুলে দেখালো। অসন্তুষ্ট লোকটি আবার বললে, দেখিনা, বা'র করুন।